ISSN 1605-7023

ষষ্ঠদশ বর্ষ সংখ্যা
১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

ষষ্ঠদশ বর্ষ সংখ্যা ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদনা পর্ষদ

আ,ল,ম, আবদুর রহমান এনডিসি	চেয়ারম্যান
মোঃ জায়েদুল হক মোল্লা এনডিসি	সদস্য
রঞ্জিৎ কুমার সেন এনডিসি	সদস্য
ড. মোঃ শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ	সদস্য
ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ	সদস্য
বণিক গৌর সুন্দর	সদস্য
ড. রিজওয়ান খায়ের	সদস্য

সম্পাদক: ড. মোঃ শফিকুল হক

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা ১৩৪৩
www.bpatc.org.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, ষষ্ঠদশ বর্ষ সংখ্যা ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 16th Year Issue 1423/2016 AD
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Traning Centre

©বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকৃত প্রকাশকাল : চৈত্র-১৪২৩/মার্চ-২০১৭

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার : ০৫০.৩৫

টেলিফোন : ৮৮-০২-৭৭৪৫০১০-১৬ পিএবিএক্স
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭৭৪৫০২৯
ওয়েব সাইট : http:/www/bpact.org

গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ -এর ঠিকানা

এ.এফ.এম. আমীর হোসেন
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে : ফেয়ার প্লে
১৩১ ডিআইটি, এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮৪২ ০৩৫৯০৪
E-mail: fairplay904@gmail.com

লোক-প্রশাসন পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না ।

সূচিপত্র

ইতিহাসের আলোকে বঙ্গবন্ধু ৫
আ,ল,ম, আবদুর রহমান এনডিসি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা: একটি বিশ্লেষণ ২৫
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন

পিটার সিঙ্গার এর নৈতিক মডেলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন: ত্রিমাত্রিক মডেলের প্রাসঙ্গিকতা ৩৯
ড. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া

ক্ষমতা ডিসকোর্স এবং জ্ঞান: মিশেল ফুঁকোর ভাবনা ৭৯
ড. আ. ক. ম. জামাল উদ্দীন

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাংলার যশোর জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন: একটি পর্যালোচনা ৯৭
ড. মো: আমিরুল ইসলাম

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলিটদের উন্নয়ন ভূমিকা:
বগুড়া জেলার দু'টি ইউনিয়নের একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১১৩
ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ্

ইতিহাসের আলোকে বঙ্গবন্ধু

* আ,ল,ম, আবদুর রহমান এনডিসি

"My 'strength' he used to say, is that 'I love my people. My weakness is that I love them too much."- Bangladesh: A Legacy of Blood, Anthony Mascarenhas

Abstract: *Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bangalee of all times, is the Father of the nation and founder of independent Bangladesh. He has a long continuous history of struggle for the righteous cause of the people of the then East Bengal/East Pakistan. Through his noble efforts and unfettered love for this soil, he reached up to the sky high level of excellence. He was the most courageous leader of his time and beyond, so far history of Bengal has ever witnessed. He had an emotional aesthetic mind and a very big heart to love all his people without any sort of discrimination or parochialism. He had a charismatic leadership quality and personality and was an architect of preparing fearless successors. He is believed to have a supernatural sort of power to judge things blending with width of heart and wisdom. He involved himself with politics since early 1940s and was a self-made personality having renowned political figure H.S. Shurawardy as his mentor. He led the Bangalee nation towards independence gradually from 1948 to the culmination point of 26th March 1971. Being the Father of the nation, he had the opportunity to serve Bangladesh from 1972 to August 1975. The cruel death, plotted by some heinous miscreants snatched him away from us. But still he is alive in the heart of millions of Bangalees in home and abroad. In this article a short synopsis of his dreams and realities have been depicted with objectivity and admiration. The secret philosophy of his life and love for Bangalee People is 'I love my people. My weakness is that I love them too much'.*

একজন সত্যাদর্শী রাজনীতিক হিসেবে বঙ্গবন্ধু যে সাহস, সততা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বঞ্চনার ইতিহাস অত্যন্ত চমৎকার সাবলীল ভাষায় ১৯৫৫-১৯৫৬ সময়কালে পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদে অকাট্য তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে উপস্থাপন করেছেন, তা আমাদের অভিভূত করে। জন্ম তারিখ হিসাব করলে বঙ্গবন্ধুর বয়স তখন ৩৬ বছর। ৩৬ বছরের একজন তরুণ যে চমৎকার প্রজ্ঞা ও তেজস্বীতার সাথে অপরিমেয় দুঃসাহসী আত্মবিশ্বাস নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। শাসনতান্ত্রিক পরিষদে দেয়া বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যগুলোর পুরোপুরি সংকলন ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হওয়া উচিত। বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের পথে এগুলো এক দুর্লভ

রেক্টর (সরকারের সচিব), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভার, ঢাকা

দলিল। সত্যি বলতে কী, এসব বক্তব্য থেকে অনুমিত হয়, বাংলাদেশের প্রতি বঙ্গবন্ধুর হৃদয়জাত নিখাদ ভালোবাসা কত নিবিড় ও প্রবল ছিল। ছিল দুকূলপ্রসারী সমুদ্রের জলরাশির মতো। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, ১৯৪৬-৭০ সময়কালের বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। যা কিছু হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে, বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাতে প্রাধান্য পেয়েছে। কাউকে অযৌক্তিকভাবে ছোট করা হয়েছে, কাউকে সীমারেখার ঊর্ধ্বে তুলে বড় করা হয়েছে। আমার মনে হয় যে সময়ের কথা আমরা বললাম, সে সময়ের সত্যিকার ইতিহাস রচনা করলে বঙ্গবন্ধুর চিন্তার ব্যাপ্তি ও সৎ সাহসের অদৃশ্য পরিমন্ডল নিঃসন্দেহে উন্মোচিত হবে। বাংলা-বাঙালীর প্রতি চিরায়ত মোহাচ্ছন্ন ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধু অনেক রথী-মহারথীকে অতিক্রম করে গেছেন, পৌঁছে গিয়েছিলেন আকাশ ছোঁয়া নান্দনিক মর্যাদা ও উচ্চতায়। আসল কথায় ফিরে আসি। আমরা এ নিবন্ধে মানুষ বঙ্গবন্ধুর আসল প্রতিকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। একটি বিষয় ইদানীং লক্ষ্য করি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেকে তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হন। এখানে দুধরণের লেখক-সমালোচক রয়েছেন। একদল অন্ধস্তাবক, আরেকদল অসাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত জাত শত্রু-বস্তুনিষ্ঠতার মানদন্ডে দুটিই অগ্রহণযোগ্য। বঙ্গবন্ধুকে দেখতে হবে বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে সাহসী ও কৌশলী যোদ্ধা হিসেবে। তাঁকে দেখতে হবে বস্তুনিষ্ঠভাবে তৃতীয় নয়নে। আসলে বঙ্গবন্ধুর সাথে কারো তুলনা চলে না। বঙ্গবন্ধুর আহবানে সারা বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিল। বাঙালী জাতি তাদের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন বঙ্গবন্ধুর মাঝে দেখতে পেয়েছিল। একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই, বঙ্গবন্ধু সৌভাগ্যক্রমে এক ঝাঁক বিশ্বস্ত সহকর্মী পেয়েছিলেন। যারা তাঁর হাতে হাত রেখে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা সহ্য করে বাঙালীর স্বাধিকার, ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা অর্জনের যাত্রাপথ সহজ করে দিয়েছিলেন। তাদের অনেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে মহিরুহের সমতূল্য। তাঁরা আজ বেঁচে নেই। মনে রাখতে হবে, আমরা যেন তাঁদের ভুলে না যাই, কোনভাবে তাঁদের খাটো না করি। সত্যি কথা বলতে কী বঙ্গবন্ধু ছিলেন নেতৃত্ব তৈরির কারিগর। তাই দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের হাতে বন্দী থাকলেও, মুক্তিযুদ্ধ থেমে থাকেনি। তাঁর সহযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মুজিবের অবর্তমানে তাঁর নির্দেশনায়, তারই নামে যুদ্ধ হয়েছে। তাঁর মহান সহকর্মীদের মধ্যে জাতীয় চার নেতার কৃতিত্ব ও অবদান আজ ইতিহাসের অংশ।

বঙ্গবন্ধু অতি উচ্চ স্তরের মানুষ ছিলেন। তাঁর মধ্যে সমাহার ঘটেছিল চমৎকার মানবিক মূল্যবোধ। বাহ্যত বজ্রকঠিন মনে হলেও তাঁর ছিল একটি অতি সংবেদনশীল কোমল হৃদয়। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রচন্ড অনুরাগ ছিল। পরম শত্রুর প্রতিও সদয় হতে তাঁর কখনো বাঁধেনি। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হৃদয় দিয়ে বিচার করার এক অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর ছিল। সঙ্গীতের প্রতি বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি ছিল তার প্রবল অনুরাগ। কলিম শরাফীর কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে বঙ্গবন্ধু ভীষণ ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান শুনতে শুনতে অনেক সময় তিনি

আবেগের আতিশয্যে অশ্রুসজল হয়ে পড়তেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও উদার। কোন রকম সাম্প্রদায়িক কূপমন্ডূকতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বাঙালী জাতীয়তাবাদে সুদৃঢ় বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু হিন্দু-মুসলমানে কখনো বিভেদ সৃষ্টি করেননি। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি জীবনের শুরু থেকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। সে প্রেক্ষিতে প্রথাগত পড়াশুনায় পর্যাপ্ত সময় দেয়া তাঁর পক্ষে দুরূহ ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত ও স্ব-শিক্ষিত। ১৯৯৯ সালে লেখক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিধন্য গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় গিয়েছিলেন। পৈত্রিক বাড়ীতে আলমিরা ভর্তি বঙ্গবন্ধুর সংগৃহীত পুস্তক পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে তাঁর যে জ্ঞানচর্চার প্রতি সহজাত প্রবল আগ্রহ ছিল, তার প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সমাহার রয়েছে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের হাত ধরে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতিতে আগমন ও বিকাশ। রাজনীতির মূল পাঠ বঙ্গবন্ধু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক গুরু হিসেবে আজীবন সম্মান করেছেন। সাম্যবাদ ও মানবতাবাদের প্রবক্তা বিভাগ পূর্ব বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের রাজনীতির ক্লাসে তিনি পাঠ গ্রহণ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলতে গেলে তার রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রসঙ্গটি আবশ্যিকভাবে এসে যায়। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন উদার ও প্রশান্ত মনের নির্ভীক মানুষ। এই আত্মভোলা মানুষটি নিজের জন্য কিছুই করেননি। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে পূর্ব বাংলার বঞ্চিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ, দেশ বিভাগের সময় যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত সাধনা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রায় তিন বছর ভারতে অবস্থান করে সেখানকার মুসলমানদের জীবন রক্ষা ও পাকিস্তান-ভারতে সংখ্যালঘুদের জানমাল সুরক্ষার জন্য নির্ভীক যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন হিন্দু- মুসলমানের সম্প্রীতি রক্ষায় শান্তি মিশনের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব ভারত-পাকিস্তান ছোটাছুটি করে উভয় দেশে সংখ্যালঘুদের জানমাল হেফাজতের আন্দোলন চালাতে থাকেন। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে জনাব সোহরাওয়ার্দী ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে আগমন করেন। পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রথমে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। পরবর্তীতে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু তখন আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক। বিশিষ্ট ছাত্রনেতা শামসুল হক সাহেব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এভাবে নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তার স্নেহধন্য শেখ মুজিবুর রহমান আবার একই পতাকাতলে সমবেত হন। বঙ্গবন্ধু চিন্তা-চেতনায় আজীবন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য ছিলেন। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু শহীদ সাহেব সম্পর্কে

সশ্রদ্ধ উচ্চারণ করেছেন। আমরা তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি-"শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, নীচতা ছিল না, দল মত দেখতেন না, কোটারি করতে জানতেন না, গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না। উপযুক্ত হলেই তাকে পছন্দ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। কারণ, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম। তাঁর সাধুতা, নীতি, কর্মশক্তি ও দক্ষতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চাইতেন"।

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' যা কিনা ১৯৬৬-৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করার পর তিনি রচনায় হাত দিয়েছিলেন; সমসাময়িক ইতিহাস হিসেবে তার মূল্য অপরিসীম। এই আত্মজীবনী লেখার পেছনে শহীদ সাহেবের স্মৃতি তাঁকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক Mentor শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ সালে বৈরুতে পরলোক গমন করেন। আইয়ুবের কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জবানীতে শুনা যাক-"একদিন সন্ধ্যায় বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে জমাদার সাহেব চলে গেলেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ছোট্ট কোঠায় বসে বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথা। কেমন করে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হল। কেমন করে তাঁর স্নেহ পেয়েছিলাম। কিভাবে তিনি আমাকে কাজ করতে শিখিয়েছিলেন এবং কেমন করে তাঁর স্নেহ আমি পেয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল লিখতে ভাল না পারলেও ঘটনা যতদূর মনে আছে লিখে রাখতে আপত্তি কি।............ তাই খাতাটা নিয়ে লেখা শুরু করলাম"।

বাংলা নামে দেশ গড়ার ইতিহাস রয়েছে। ২৫ আগস্ট ১৯৫৫ সালে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের গণপরিষদে দাঁড়িয়ে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করার বিরুদ্ধে যৌক্তিক ভাষায় বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- "The word Bengal has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted"। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তর করেছিল। বিষয়টি বঙ্গবন্ধু কখনো ভুলেননি। তাই দেখা যায়, ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবসের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, এখন থেকে আর পূর্ব পাকিস্তান নয়, দেশটার নাম হবে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়- "এক সময় এ দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে...। একমাত্র বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই...। আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু বাংলাদেশ।"

জ্ঞানতাপস জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক 'Muzaffar Ahmed Choudhury Memorial Lecture 1980'-এর ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সে সময়ে বঙ্গবন্ধুর নাম ইতিহাস থেকে প্রায় নির্বাসিত। বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা যথেষ্ট সাহসের পরিচায়ক। প্রফেসর রাজ্জাক তার 'Bangladesh State of the

সশ্রদ্ধ উচ্চারণ করেছেন । আমরা তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি-"শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, নীচতা ছিল না, দল মত দেখতেন না, কোটারি করতে জানতেন না, গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না । উপযুক্ত হলেই তাকে পছন্দ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন । কারণ, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম । তাঁর সাধুতা, নীতি, কর্মশক্তি ও দক্ষতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চাইতেন" ।

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' যা কিনা ১৯৬৬-৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করার পর তিনি রচনায় হাত দিয়েছিলেন; সমসাময়িক ইতিহাস হিসেবে তার মূল্য অপরিসীম । এই আত্মজীবনী লেখার পেছনে শহীদ সাহেবের স্মৃতি তাঁকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল । উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক Mentor শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ সালে বৈরুতে পরলোক গমন করেন । আইয়ুবের কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জবানীতে শুনা যাক-"একদিন সন্ধ্যায় বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে জমাদার সাহেব চলে গেলেন । ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ছোট্ট কোঠায় বসে বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথা । কেমন করে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হল । কেমন করে তাঁর স্নেহ পেয়েছিলাম । কিভাবে তিনি আমাকে কাজ করতে শিখিয়েছিলেন এবং কেমন করে তাঁর স্নেহ আমি পেয়েছিলাম । হঠাৎ মনে হল লিখতে ভাল না পারলেও ঘটনা যতদূর মনে আছে লিখে রাখতে আপত্তি কি ।............ তাই খাতাটা নিয়ে লেখা শুরু করলাম" ।

বাংলা নামে দেশ গড়ার ইতিহাস রয়েছে । ২৫ আগস্ট ১৯৫৫ সালে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের গণপরিষদে দাঁড়িয়ে তেজোদীপ্ত কন্ঠে পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করার বিরুদ্ধে যৌক্তিক ভাষায় বিরোধিতা করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন- "The word Bengal has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted" । পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তর করেছিল । বিষয়টি বঙ্গবন্ধু কখনো ভুলেননি । তাই দেখা যায়, ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবসের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু দীপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করেন, এখন থেকে আর পূর্ব পাকিস্তান নয়, দেশটার নাম হবে বাংলাদেশ । বঙ্গবন্ধুর ভাষায়- "এক সময় এ দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে... । একমাত্র বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই... । আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু বাংলাদেশ ।"

জ্ঞানতাপস জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক 'Muzaffar Ahmed Choudhury Memorial Lecture 1980'-এর ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন । সে সময়ে বঙ্গবন্ধুর নাম ইতিহাস থেকে প্রায় নির্বাসিত । বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা যথেষ্ট সাহসের পরিচায়ক । প্রফেসর রাজ্জাক তার 'Bangladesh State of the

Nation' বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর নিরপেক্ষ মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন-"এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বঙ্গবন্ধু দেশপ্রেমে বিহ্বল ছিলেন। দেশপ্রেমের সংজ্ঞাকে যতো ব্যাপক করে তোলা যাক না কেন, বঙ্গবন্ধু ততোখানিই তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন। যে প্রেম তাঁকে বিহ্বল করেছিল, তা দেশের প্রতি যে হালকা আবেগ আমরা অনুভব করি এবং যাকে দেশপ্রেম হিসেবে চালিয়ে থাকি, তার থেকে অনেক বেশি আলাদা। বঙ্গবন্ধু একজন ভালো মুসলমান, অনেক ক্ষেত্রে, প্রায় বিশুদ্ধবাদী মুসলমান ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি মুসলিম লীগের একজন অনুগত সদস্য ও পাকিস্তান সৃষ্টির ধারণার সোৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে কাজে অংশগ্রহণও করেছিলেন। শেষের অনেক আগেই তিনি তাঁর অন্তিম এবং চিরন্তন ভালোবাসার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলেন। পৃথিবীর সেই ছোট্ট অংশটার প্রেমে তিনি বিহ্বল ছিলেন, যার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ। এ ধরণের ভালোবাসা বিপজ্জনক হতে পারে। বঙ্গবন্ধুই তার প্রমাণ"।

প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক ক্ষেত্রবিশেষে বঙ্গবন্ধুর সমালোচনাও করেছেন তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নে তিনি বোধ হয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব, যিনি বঙ্গবন্ধুর মাঝে বাঙালী জাতির প্রাণের স্পন্দন প্রকাশের আর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। তার ভাষায় "এই উপমহাদেশের সমগ্র অঞ্চল বা কোন কোন বিশেষ অংশের সঙ্গে ধর্ম বা সমাজের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র পরিচয় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অদম্য ইচ্ছাই এসব কিছুকে অতিক্রম করেছে। এই আকাঙ্খার প্রতীক হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু এবং এটাই এই বিশেষ মানুষটা আর জনতার মধ্যে গড়ে তুলেছিল এক অবিচ্ছেদ্য মেলবন্ধন। বঙ্গবন্ধুর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর গুণের তালিকা প্রস্তুত করা বা তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর স্ফীতবাক হওয়া অপ্রাসঙ্গিক। জনতা তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল। কারণ তাঁর মধ্যে তারা জাতি হিসেবে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার যে গভীর ইচ্ছা তার বহিঃপ্রকাশ দেখেছিল"।

বাংলার দুজন অবিসংবাদিত নেতার মধ্যে বাঙালীত্ব ও মুসলমানত্বের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। একজন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও অপরজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেরে বাংলা সম্পর্কে তার শিক্ষক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদকে বলেছিলেন- "ফজলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি বাঙ্গালী। সেই সঙ্গে ফজলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি মুসলমান। খাঁটি বাঙ্গালীত্বের সাথে খাঁটি মুসলমানত্বের এমন অপূর্ব সমন্বয় আমি আর দেখি নাই। ...খাঁটি বাঙ্গালীত্ব ও খাঁটি মুসলমানত্বের সমন্বয়ই ভবিষ্যত বাঙ্গালীর জাতীয়তা। ফজলুল হক ঐ সমন্বয়ের প্রতীক। এ প্রতীক তোমরা ভেংগোনা। ফজলুল হকের অমর্যাদা তোমরা করোনা। ....বাঙ্গালী যদি ফজলুল হকের মর্যাদা না দেয়, তবে বাঙ্গালীর বরাতে দুঃখ আছে"। শেরে বাংলা ১৯৩৭ সালে তার দল কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিলেন। হয়েছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। ১৯৩৮

সালে কৃষক প্রজা পার্টি হক সাহেবের বিরূদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করে। বঙ্গীয় কংগ্রেস তাতে পূর্ণ সমর্থন দেয়। অনাস্থা প্রস্তাবে কৃষক প্রজা পার্টি হেরে যায়। তখনকার পটভূমিতে আচার্য পিসি রায়ের এ ভবিষ্যতবাণী। ১৯৪৩ সালে ফজলুল হক দ্বিতীয় মেয়াদে বাংলার প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তিনি ক্রমশ পর্দার অন্তরালে চলে যেতে থাকেন। মি. জিন্নাহর সুচতুর চাল, বাংলার রাজনীতিতে খাজা-নবাবদের উত্থান, পাকিস্তান আন্দোলনের প্রচন্ড গতিশীলতা, হক সাহেবের এক বুক অভিমান, সবকিছু মিলিয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে দৃশ্যান্তরে চলে যান। ফলশ্রুতিতে একক নেতা হিসেবে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের আস্থাভাজন আর কেউ রইলোনা। তাই ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের প্রাক্কালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করতে পারেনি। তবুও বাংলার সাধারণ মানুষ ফজলুল হককে কত বেশী ভালবাসতো বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পড়লে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন-"শেরে বাংলা মিছামিছিই শেরে বাংলা হন নাই। বাংলার মাটিও তাকে ভালবেসে ফেলেছিল। যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেছি, তখনই বাঁধা পেয়েছি।" বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীর আরেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন-"একদিন আমার মনে আছে, একটা সভা করেছিলাম আমার নিজের ইউনিয়নে, হক সাহেব কেন লীগ ত্যাগ করলেন, কেন পাকিস্তান চান না এখন। কেন তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সাথে মিলে মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন। এই সমস্ত আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ একজন বৃদ্ধলোক যিনি আমাদের বংশের সকলকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, দাঁড়িয়ে বললেন- যাহা কিছু বলার বলেন, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই বলবেন না। তিনি যদি পাকিস্তান না চান, আমরাও চাই না। জিন্নাহ কে? তার নামওতো শুনি নাই। আমাদের গরীবের বন্ধু হক সাহেব।" বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ১৯৬৯ সালের দিকে লেখা। তখন হক সাহেব জীবিত নেই। বঙ্গবন্ধু আজীবন ফজলুল হক সাহেবের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন। ফজলুল হক সাহেব ও বঙ্গবন্ধুকে স্নেহ করতেন অকৃত্রিম পুত্র বাৎসল্যে।

আগেই বলেছি, ফজলুল হক ছিলেন আপাদমস্তক বাঙালী ও মুসলমান। হক সাহেবের পর ইতিহাসের পথ ধরে বঙ্গবন্ধুর আবির্ভাব। বাঙালীত্বের ও মুসলমানত্বের সহজাত গুণাবলী তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছিল। পোশাকে-আশাকে, খাওয়া-দাওয়া, সংস্কৃতি ভাবনা সব মিলিয়ে ফজলুল হকের পর বঙ্গবন্ধু একমাত্র নেতা, যার মধ্যে বাঙালী জনগোষ্ঠী তাদের মুক্তির দীপশিখা প্রত্যক্ষ করেছিল। পাকিস্তানের রাজধানী করাচী তার কাছে ভাল লাগে না। কেননা ওখানে বাংলার চোখ জুড়ানো শ্যামলিমা নেই। রাজবন্দী হিসেবে জেলে থাকতে তার আপত্তি নেই, যদি সে জেল বাংলার জেল হয়। পাঞ্জাবের জেল তার পছন্দ নয়, কেননা মাংস-রুটি খেতে তার ভাল লাগে না। জেল-জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন সবকিছুই বঙ্গবন্ধুর ওপর হয়েছে। তার জীবনের সোনালী দিনগুলো কেটেছে পাকিস্তানের জেলে মিথ্যা মামলার আসামী হয়ে। ফাঁসির রজ্জু তার মাথার ওপর ঝুলেছে। দুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তিনি ফিরে এসেছেন। প্রথমে ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার

এক নম্বর আসামী হিসেবে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন। ফাঁসির সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু এ অন্যায় মামলার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল পূর্ব বাংলা। তাদের মুখে একটাই শ্লোগান- 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। প্রচন্ড গণবিদ্রোহের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে গেল আইয়ুবের সাজানো মামলা। পালিয়ে বাঁচলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারক এস, এ রহমান। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব নিঃশর্তভাবে তুলে নিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। মুক্ত হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামী। দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালে। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা, যুদ্ধ ঘোষণাসহ দেশদ্রোহিতার অভিযোগে জেনারেল ইয়াহিয়া সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু করে। সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির আদেশ দেয়। ততদিনে পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে। জেনারেল ইয়াহিয়া তখন নখ-দন্তহীন এক জেনারেল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এই মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে অস্বীকার করায় অলৌকিকভাবে বঙ্গবন্ধু ফাঁসির মঞ্চ হতে ফেরত আসেন। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান। তাকে অত্যন্ত গোপনে পিআইএর বোয়িং ৭০০ যোগে লন্ডনে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। তাঁর সাথে ছিলেন এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী। ৯ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ Royal Air Force-এর কমেট বিমানে লন্ডন ত্যাগ করেন। ১০ জানুয়ারি দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে পৌঁছেন।

১০ জানুয়ারি অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানযোগে তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। বিমান থেকে নেমেই তিনি দেশের মাটি ছুঁয়ে শপথ করেন। হয়তোবা গুনগুন করে গাইতে থাকেন রবীন্দ্রনাথের সেই গান "ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা.."তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে তাঁকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার মাঝে নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু সে মহাসমাবেশে আবেগাপ্লুত হয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছিঃ "গত ৭ মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম 'দূর্গ গড়ে তোল'। আজ আবার বলছি 'আপনারা একতা বজায় রাখুন।' আমি বলেছিলাম, 'বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো'। বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশরূপেই বেঁচে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নাই। ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলবো, মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।"

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভবিষ্যত অনুসরণীয় আদর্শ কি হবে, সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন- "সকলে জেনে রাখুন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। ইন্দোনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয়। কিন্তু অদৃষ্টের

পরিহাস, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।"

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে ২৪ বছরে ধর্মের নামে যেসব অধর্মের কাজ পাকিস্তানী শাসকচক্র করেছিল, সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। রাষ্ট্রের ওপর ধর্ম অযাচিত হস্তক্ষেপ করুক, এটা বঙ্গবন্ধু তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে সমর্থন করতেন না। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা ছিল। বঙ্গবন্ধু জানতেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তিনি চেয়েছিলেন, বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সকল ধর্মের মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের নিজ-নিজ ধর্ম পালন করবে। বঙ্গবন্ধু দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করলেন- "আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানি... এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না।"

এবার স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু যা করতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে আলোকপাত করব। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যা কিছু দরকার, বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছর সময়কালে সবকিছু করেছিলেন। পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, পরিকল্পনা ব্যবস্থা সবকিছু তিনি ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তান ও তার বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ প্রণিধানযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। জেনারেল নিয়াজী ও তার সেনাদের আত্মসমর্পণের পর ভারতীয় বাহিনীর কয়েক ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে রয়ে গিয়েছিল। তারা বাংলাদেশে দীর্ঘদিন অবস্থান করলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হবার সম্ভাবনা ছিল। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শেখ মুজিবুর রহমান খুব ভাল করে বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কোলকাতা সফরে গেলে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে একান্ত বৈঠকে তাকে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মিসেস গান্ধীর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার প্রভাব ছিল ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির লক্ষ্যে সে আলোচনার অংশবিশেষ নিম্নে তুলে ধরছি:

> "**শেখ মুজিবঃ** মাদাম, আপনি কবে নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করবেন।
>
> **ইন্দিরা গান্ধীঃ** বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তো এখন পর্যন্ত নাজুক পর্যায়ে আছে। পুরো সিচুয়েশন বাংলাদেশ সরকারের কন্ট্রোলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা কি বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য আপনি যেভাবে বলবেন সেটাই করা

হবে।

শেখ মুজিবঃ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রায় ত্রিশ লাখ লোক আত্মাহুতি দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে আইন ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির জন্য আরো যদি লাখ দশেক লোকের মৃত্যু হয় আমি সে অবস্থাটা বরদাশত করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই বলছি, বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ইন্দিরা গান্ধীঃ এক্সেলেন্সি, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আগামী ১৭ মার্চ বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে।

শেখ মুজিবঃ মাদাম, কেন এই বিশেষ দিন ১৭ মার্চের কথা বললেন।

ইন্দিরা গান্ধীঃ এক্সেলেন্সি, প্রাইম মিনিস্টার, ১৭ মার্চ হচ্ছে আপনার জন্মদিন।"

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বড় সাফল্য হলো জাতিকে নয় মাসের মধ্যে একটি সংবিধান উপহার দেয়া। ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে Constituent Assembly গঠন করা হয়। পৃথিবীর সমুদয় উত্তম সংবিধান পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গণপরিষদে খসড়া সংবিধান অনুমোদিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে এ সংবিধান কার্যকর করা হয়। সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত হয়। ৭২-এর সংবিধানকে অদ্যাবধি একটি উৎকৃষ্ট সংবিধানের প্রতিকৃতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সংবিধানের প্রণিধানযোগ্য বিশেষত্ব হলো Fundamental Rights বা মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদসমূহ। এই সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে- Freedom of thought and conscience is guaranteed অর্থাৎ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো। একটি প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্র হিসেবে এ শাসনতন্ত্র বিশ্বের শাসনতন্ত্র বিশারদদের প্রশংসা অর্জন করে। সংবিধানের ১৫৩(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক বাংলায় একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকবে। আরো উল্লেখ করা যায় যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে। এটি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হলে পরিকল্পিত অর্থনীতির কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৫-এ বলা হয়েছে- "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন...."। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু পরিকল্পনা কমিশনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু ছয় দফা

ভিত্তিক যে দ্বি-অর্থনীতির প্রস্তাব করেছিলেন, তার পিছনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একঝাঁক তরুণ শিক্ষক। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাজিত বৈষম্য ও তার বাস্তবসম্মত সমাধান হিসেবে দুই অর্থনীতির ধারণা বিভিন্ন সভা-সেমিনারের মাধ্যমে তারাই সামনে নিয়ে আসেন। এতে সারা পাকিস্তানে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে যারা রাজনীতিবিদদের সহায়তা করতেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম, প্রফেসর মাহফুজুল হক, প্রফেসর আনিসুর রহমান, প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর মোশাররফ হোসেনসহ আরো অনেকে।

ইতিহাসের অংশ হিসেবে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের প্রেক্ষিতে জনগণের প্রতি প্রদত্ত ম্যান্ডেটের অংশ হিসেবে ছয় দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে দুটি কমিটি করে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক স্টিয়ারিং গ্রুপ গঠন করা হয়, তাতে সদস্য ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও ড. কামাল হোসেন। সংবিধানের খসড়া তৈরীর দায়িত্ব ছিল ড. কামাল হোসেনের ওপর। তার পাশাপাশি একটি পেশাজীবী বিশেষজ্ঞ গ্রুপ গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ গ্রুপে ছিলেন প্রফেসর মুজাফ্‌ফর আহম্মদ, প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর আনিসুর রহমান, প্রফেসর খান সারওয়ার মুর্শিদ ও প্রফেসর নুরুল ইসলাম। ছয় দফার ভিত্তিতে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয় অত্যন্ত যত্ন সহকারে। অনুলিপি গোপনীয়তার সাথে ড. কামাল হোসেনের কাছে সংরক্ষিত থাকত। খোন্দকার মোশতাক ঘন ঘন অনুলিপি ধার নিতেন। এ সংবিধানের কিছু মৌলিক বিষয়ে তিনি একমত ছিলেন না। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরের কোন একটি পত্রিকায় ছয় দফার মূল বিষয়গুলো ছাপা হয়ে যায়। এতে পশ্চিম পাকিস্তানে হৈ-চৈ পড়ে যায়। খসড়া সংবিধান ফাঁস হওয়ায় সবচেয়ে বড় অসুবিধাটি হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র ঠেকানোর জন্য প্রস্তুতির সুযোগ পেয়ে যায়। প্রফেসর নুরুল ইসলামের মতে ছয় দফা ভিত্তিক প্রস্তুত সংবিধানের খসড়া ফাঁস করার কাজটি হয়তোবা খোন্দকার মোশতাকই করেছিলেন।

আসল কথায় ফিরে আসি। বঙ্গবন্ধুর অভিপ্রায় মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশনকে ঢেলে সাজানো হলো। অধ্যাপক নুরুল ইসলামকে পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদায় পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলো। প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর আনিসুর রহমান ও প্রফেসর মোশাররফ হোসেনকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নিয়োগ দেয়া হলো। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর নিজের হাতে থাকলো। পরিকল্পনা কমিশন কঠোর পরিশ্রম করে 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮' প্রণয়ন করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর মুখবন্ধে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে- A plan

for reconstruction and development of the economy taking into account the inescapable political, social and economic realities of Bangladesh বলে অভিহিত করেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন পরিকল্পনা প্রণয়ন শেষ কথা নয়। পরিকল্পনায় ঘোষিত লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন জরুরী। তাই তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন- No plan however well formulated, can be implemented unless there is a total commitment on the part of the people of the country to work hard and make necessary sacrifices"

পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রফেসর নুরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার শাসনকালের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখেছেন। বিষয়গুলো তার Making of a Nation Bangladesh: An Economists Tale পুস্তকে স্থান পেয়েছে। আমরা তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। ১৯৭২ পূর্ববর্তী সময়কাল সম্পর্কে তার মতামত বস্তুনিষ্ঠ ও যথার্থ। তিনি বলেছেন- "৭১ পূর্ববর্তী সময়টায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান অব্যাহতভাবে যে দূরদৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন, তা লক্ষ্যণীয়। এই মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি অন্য কোন বিষয়কে সাময়িকভাবে উপেক্ষা করেছিলেন। এই লক্ষ্য অর্জনে দেশকে সংগঠিত ও উজ্জীবীত করার ক্ষেত্রে তার সমসাময়িকদের তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক উপরে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় অবশ্য পরিস্থিতি রাতারাতি পাল্টে যায়। চ্যালেঞ্জগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অনেক বিচিত্র বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল"। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার বিষয়ে তার করণীয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো তার সময়কালে দেশীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি কোনটাই তার অনুকূলে ছিল না।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বিদেশী নেতৃবৃন্দের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রফেসর ইসলামের মন্তব্য হচ্ছে "বিদেশী নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রেও তিনি দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছিলেন। পরিকল্পনা কমিশনে দায়িত্ব পালন করার সময় আমি তার সকল বিদেশ সফরে সঙ্গী ছিলাম। আমি দেখেছি যে, বিভিন্ন বিদেশী নেতাদের সাথে বৈঠক, আলোচনা ও সমঝোতার সময় তিনি অনেক বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে অবলীলাক্রমে কথোপকথন চালিয়ে যেতেন। তিনি তাঁর আন্তরিক ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের গুণে ঐ সব নেতাদের সঙ্গে দ্রুত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন"। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জোট নিরপেক্ষ নীতির অনুসারী ছিলেন। যদিও Strategic কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়টির আলাদা Prespective রয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টির একটা আলাদা Implication ছিল। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবস্থান ছিল জোরালো জাতীয়তাবাদী ও বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। প্রফেসর নুরুল ইসলাম অভিমত ব্যক্ত করেন-"…. কোন দেশের

আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তিনি কারো সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেননি। তাঁর দৃষ্টিতে যে কোন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূল বিবেচনার বিষয়টি হচ্ছে, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ এবং একই সঙ্গে তিনি এটাও বিবেচনায় রাখতেন যে, এ সম্পর্কের কারণে যাতে তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।" ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুরের নিজস্ব নীতি ও ধ্যান ধারণা কাজ করেছে। তিনি সব সময় বাংলাদেশের স্বার্থকে তুলে ধরতেন। প্রফেসর ইসলামের মতে "শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে সে ধরণের সহযোগিতাকে গুরুত্ব দিতেন, যেগুলোতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হতে পারে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সার্বিক রাজনৈতিক সম্পর্কের বিচারের পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে উঠতে পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালের যুদ্ধে তার ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততার কারণে শেখ মুজিবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন।"

পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। পরিকল্পনা কমিশনে বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন আরেকজন অর্থনীতিবিদ ছিলেন প্রফেসর আনিসুর রহমান। তিনি স্বাধীনচেতা ও মেধাবী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রফেসর আনিসুর রহমানের সাথে এটিই বঙ্গবন্ধুর প্রথম সাক্ষাৎ। স্থান পরিকল্পনা কমিশন। সাথে ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং পরিকল্পনা কমিশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। বঙ্গবন্ধুকে দেখার পর প্রফেসর আনিসুর রহমান তার ভেতরের অনুভূতি লিপিবদ্ধ করছেন এভাবে- "As my first meeing with the 'Father of the Nation in independent Bangladesh' it was a rather enotional meeting on my part. This great leader with his extraordinary leadership and charisma mobilized the people of Bangladesh for a War of Independence initially with only bamboo sticks in their hands, and it is the strength of determination of our people thus awakened that finally got us our independence".

প্রফেসর আনিসুর রহমান নিখাদ দেশপ্রেমিক। তিনি দেশের মঙ্গল চান। আনিসুর রহমান বঙ্গবন্ধুর সাথে দেশ গড়ার বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তিনি দৃঢ় আবেগের সাথে বললেন বঙ্গবন্ধু যুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থেকেও জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের অমর মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করেছেন। দেশ আজ স্বাধীন। এখন দেশ গড়ার সময়। তিনি বঙ্গবন্ধুকে একই Charisma ব্যবহার করে জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও জাতিগঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার অনুরোধ করেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে অন্তরঙ্গ পরিবেশে দু'জনের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক দেশ গড়ার কাজে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার পদ্ধতি সম্পর্কে আনিসুর রহমানের এক অভিনব পরিকল্পনা। বঙ্গবন্ধু জানতে চাইলে তিনি আবেগাপ্লুত

ভাষায় বললেন- ....You imagine that you are physically leading the liberation war. You know that this was not conventional war, this was guerrilla war, Imagine that you are moving with the people from village, from jungle to jungle, as a guerrilla leader, people of the villages, poor people, are giving you shelter, you are sharing with all others whatever food they eat, sometimes going hungry when they have no food and yet inspiring everyone to go on fighting. Sometimes you have nowhere to stay, and are spending the nights with your comrades in the woods or in the field. After fighting in this way for nine months you finally emerge victorious and take charge of running the independent country. The nation now expects from you that what you would have done then. বঙ্গবন্ধু জিঞ্জেস করলেন- "What would I have done?" আনিসুর রহমান বললেন-" It will be insolence on my part to say anything more. You have to close your eyes and enter into that process. And you have to do that which you would have done coming out of that process." আনিসুর রহমান লিখেছেন-আমি দেখলাম জাতির পিতার অবয়ব রক্তিমাভ হয়ে উঠছে। আমি কিছুটা শংকা বোধ করলাম। আনিসুর রহমানের তখনকার অনুভূতি হচ্ছে- I had released my pent up emotion of many days by telling him all this in this way, and hoped that he did not mind" বঙ্গবন্ধু বললেন- Of course, why should I mind, This is why I have kept you all do come from time to time and advise me". । এখানেই বঙ্গবন্ধুর মাহাত্ম্য। আলোকিত গুণীজনদের সম্মান করতে তিনি কখনো কার্পণ্য করেননি। বিনিময়ে উদারনৈতিক মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন চিরদিন। স্বাধীনতা উত্তর জাতি গঠনকালে এক কঠিন সময়ে অর্থনীতিবিদ আনিসুর রহমানের সাথে বঙ্গবন্ধুর অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনার আকরগ্রন্থ তারই লিখিত Though Moments in History-Memoirs of Two Decades of Intellectual and Social life (১৯৭০-১৯৯০) ।

প্রফেসর আনিসুর রহমান ও বঙ্গবন্ধুর কথা যখন এসেছে, আরেকটি বিষয় বলে এ বিষয়ের ইতি টানবো। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাস। একদিন জাসদের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর রহমানের বাসায় এসে হাজির। তাঁর ছাত্র হিসেবে দাবী করে অনুরোধ করলেন- "স্যার আপনি খুব স্বাধীনচেতা লোক, আপনি তাদের দল করেন না। জাসদ ১২ মে রমনা মাঠে র‍্যালির আয়োজন করেছে। আপনাকে ঐ র‍্যালিতে বক্তব্য দেয়ার অনুরোধ করছি"। প্রফেসর আনিসুর লিখেছেন- "In principle I would have no objection to addressing your rally, but I am still a Member of

the Planning Commission even if honorary, and you are asking for the Prime Minister's blood on the streets. In this situation there is a question of decorum in my attending a public rally of your party." । তিনি এও বললেন, যেহেতু তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, তার র‍্যালিতে যোগদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান তথা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন হবে। পরবর্তী দিন তিনি বিষয়টি বঙ্গবন্ধুকে জানালেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে বললেন যে- "But I told him also that you would give your permission, because you believe in democracy." । প্রফেসর আনিসুর রহমান লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু কিছুক্ষণ ভাবলেন। সামনে রাখা কাগজগুলোতে কিছু একটা আঁকাঝোকা করলেন। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন- "You....may...go. There are some good boys and girls in their party, no harm if they hear some good words from you on national building." । প্রফেসর আনিসুর রহমান যথারীতি জাসদের সভায় যোগদান করেছিলেন। পাঠ করেছিলেন তার লিখিত বক্তব্য। জাতি গঠনের কাজে শরীক হতে সবাইকে আবেদন জানালেন। বঙ্গবন্ধুর বাস্তব জ্ঞান ও মহানুভবতা কত উচ্চ ছিল আজকের দিনে তা ভাবাও অসম্ভব। রাস্তায় যারা বঙ্গবন্ধুর রক্ত চাচ্ছে, তাদের র‍্যালীতে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর পরিকল্পনা কমিশনের একজন দায়িত্বশীল সদস্যকে অনুমতি দিয়েছেন। এটা সত্যিই অবাক ও বিস্ময়কর। দেশকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা ও ভবিষ্যতের মঙ্গল প্রত্যাশায় একান্ত বিভোর ছিলেন বিধায় বঙ্গবন্ধু এ অনুমতি দেয়ার মতো দূরদৃষ্টি ও মহানুভবতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু জানতেন একটি সুষম ও উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকাশ ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল ও বাংলার মানুষের মুক্তি সম্ভবপর নয়। একটি স্বচ্ছ, সৎ ও দক্ষ জনপ্রশাসন তার কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একই সাথে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে সরকারী কর্মচারীদের সংজ্ঞা, দায়িত্বাবলী, নিয়োগ পদ্ধতি, নিয়োগের ক্ষেত্রে সমতার নীতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সন্নিবেশ করা হয়। বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে নিম্নোক্ত বিধান সংযুক্ত করা হয়- "Subject to the provisions of this Constitution Parliament may by law regulate the appointment and conditions of service of persons in the service of the Republic: Provided that it shall be competent for the President to make rules regulating the appointment and the cinditions of service of such persons until provision in that behalf is made by or under any law, and rules so made shall have effect subject to the provisions of

any such law."

প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে Administrative and Services Reorganisation Committee (ASRC) গঠন করেন। এ কমিটিতে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর আনিসুর রহমানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আঞ্চলিক দেশসমূহের অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান, গবেষণা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনান্তে কমিটি ১৯৭৪ সালে বালাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে তাদের রিপোর্ট জমাদান করে। ASRC-এর একটি উল্লেখ করার মত বিষয় হলো তাদের প্রতিবেদনে প্রথম শ্রেণীর পদে কোনরূপ কোটা ব্যতিরেকে সরাসরি নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। উর্ধ্বতন পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের পরীক্ষা পদ্ধতির জন্যও এ কমিটি সুপারিশ করে। একজন গবেষকের ভাষায়- The ASRC identified the fact that lack of professionalism had been the major defect in Civil Service and suggested for developing professionalism in BCS. ASRC explored that Knowledge is an indispensable element of achieving professionalism in Civil Service. Knowledge can be generated "through the study and practice of administration of the relevent area for a longer period of time, some cases, at least long enough to amount to a commitment- a proffessional commitment." It drew attention to the need for matching each job with the man who possessed the needed qualification, experiences, competence and for special measures required to build up new skills and expertise which are still relevent in the present day context. It recommended that to achieve the objectives, a radical change would be needed in the practices that are followed in staffing higher administrative positions. বঙ্গবন্ধু ASRC সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বল্পকালের ব্যবধানে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তিনি নির্মমভাবে সপরিবারে নিহত হওয়ার পর ASRC Report হিমাগারে চলে যায়।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল জাতীয় বেতন কমিশন গঠন ও তার রিপোর্ট বাস্তবায়ন। বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ২২০৮টি বেতনস্কেল লাভ করেছিল। বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ নৈরাজ্যকর। সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রত্যাশা ছিল একটি সুষম বেতনস্কেল। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতির পক্ষে অত স্বল্প সময়ের মধ্যে সমন্বিত বেতন কাঠামো প্রণয়ন নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ কাজ ছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭২ সালের ২১ জুলাই তারিখে প্রথম জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করা হয়। প্রফেসর মুজাফ্ফর

আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে গঠিত ASRC এর সুপারিশের আলোকে জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করা হয়। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সাবেক সচিব এম. এ. রবের নেতৃত্বে গঠিত এ কমিটিতে অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন পুলিশের সাবেক আইজিপি আলমগীর কবির, অর্থনীতিবিদ ড. আজিজুর রহমান খান, জনাব জহুরুল হক, বুয়েটের অধ্যাপক ড. এম, এ, রশীদ, কাজী আনোয়ারুল মামুন, কর্নেল জিয়াউর রহমান, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট সাইফুর রহমান, যুগ্ম-সচিব কিউ এম, এ রহিম ও সরকারের সচিব গোলাম মোস্তফা। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের মতে "সত্যি কথা বলতে কি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মেধার অনুসন্ধান করেই বঙ্গবন্ধু এ কমিশন গঠন করেছিলেন প্রশাসনের চলমান হতাশা দূর করে আমলাতন্ত্রকে একটি গতিময় সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে।" জাতীয় বেতন কমিশন জীবনযাত্রার ব্যয়, সরকারের সামর্থ্য, সমাজের আয় বৈষম্য হ্রাস, সরকারি খাতে মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করা ও সরকারি কার্য সম্পাদনে প্রণোদনার বিষয়সমূহ বিবেচনা করে ১৯৭৩ সালে ২০ মে তারিখে প্রতিবেদন পেশ করে। কমিটি পাকিস্তানের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ২২০৮টি স্কেলকে একীভূত করে মোট ১০টি গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্কেলের পার্থক্য ছিল ১:১৫.৩৮। সর্বোচ্চ বেতন ছিল ২০০০.০০ (নির্ধারিত) এবং সর্বনিম্ন বেতন ছিল ১৩০.০০। এভাবে বঙ্গবন্ধু সরকার স্বাধীনতার অতি অল্পসময়ের মধ্যে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি বেতন কাঠামো প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর আরেকটি অসামান্য সাফল্য হলো ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকল্পে ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৮ জন বিদগ্ধ ও শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ সদস্য সমন্বয়ে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা। ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই এ কমিশন গঠন করা হয়। ১৮৬৫ সালে লর্ড মেকেলে প্রণীত একটি বিতর্কিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে ছিল। পাকিস্তান পিরিয়ডে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঐ রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষা সংকোচন ও শিক্ষার ধর্মীয়করণের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল মন মানসিকতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের সে উদ্যোগ সফল হয়নি। ড. কুদরত-ই-খুদা ১৯৭৪ সালের ২৪ মে এক যুগান্তকারী রিপোর্ট পেশ করে। খুদা কমিশনের সুপারিশের অন্যতম ছিল বিদ্যমান বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে একমুখী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থাকে মোট ৩টি স্তরে বিভক্ত করে। প্রাথমিক স্তর আট বছর মেয়াদী, প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তর চার বছর মেয়াদী, নবম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। তৃতীয় স্তর উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে খুদা কমিশনের অভিমত ছিল "সমগ্র দেশে সরকারি ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচী ভিত্তিক এক এবং অভিন্ন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। একই মৌলিক কাঠামোর মধ্যে সমাজ জীবনের চাহিদার

পরিপ্রেক্ষিতে গঠন বিভিন্নতার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।" কমিশন কর্তৃক চার বছর মেয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর সুপারিশ করা হয়। এ স্তরে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং ধর্ম শিক্ষাসহ অন্যান্য শাখায় বিভক্ত হয়ে নবম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চার বছরের শিক্ষাক্রম সুপারিশ করা হয়। খুদা কমিশনের রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আশাব্যাঞ্জক পরিবর্তন ও আমূল সংস্কারের সুপারিশ করা হয়। বিশেষভাবে মানব সম্পদের চাহিদা পরিপূরণের লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষার সীমিত সুযোগ পরিপূর্ণ ও সুদক্ষ ব্যবহারের ওপর জোর দেয়া হয়।

এ প্রবন্ধের কলেবর এমনিতে দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। আর দীর্ঘতর করা সমীচীন হবে না। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বিধৌত শ্যামল পলিমাটির কোমল রসে সিক্ত বঙ্গবন্ধু এই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ভালোবাসার ও ভালো করার দায়ভার একাই নিজের স্কন্ধে তুলে নিতে চেয়েছিলেন। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি হয়তো তাকে অনুরূপ ভাবতে উৎসাহিত করেছিল। খুব সম্ভব এটাই ছিল তার সীমাবদ্ধতা। বাংলা ও বাঙালীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসায় কোন খাদ ছিল না, ছিল না কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশা। প্রফেসর কবীর চৌধুরী লিখেছেন- "বঙ্গবন্ধুকে একবার এক বিদেশী সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর প্রধান গুণ হিসাবে তিনি কী চিহ্নিত করবেন। বঙ্গবন্ধু জবাব দিয়েছিলেন, দেশের মানুষের জন্য আমার ভালোবাসা। সেই সাংবাদিক তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর আপনার প্রধান দোষ। তার উত্তরেও বঙ্গবন্ধু হেসে বলেছিলেন, দেশের মানুষের জন্য আমার ভালোবাসা।"

প্রয়াত সাহিত্যিক, সাংবাদিক আহমদ ছফা অনেক লেখায় বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করেছেন। তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক ভিন্ন মত এবং ভিন্ন পথ। অতি বামদের দলে ছিলেন আহমদ ছফা। তবে তার স্বপ্ন বিলাসী হৃদয়ে বাংলাদেশের জন্য, বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রচুর ভালোবাসা সঞ্চিত ছিল। জীবনের উপান্ত বেলায় বঙ্গবন্ধুর এই সমালোচক তাঁর সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন প্রণিধানযোগ্য বিবেচনায় তা উদ্ধৃত করে এ প্রবন্ধের ইতি টানছি:

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবুর রহমান একটি যমজ শব্দ। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। যারা এই সত্য অস্বীকার করবে, তাদের সঙ্গে কোন রকমের বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ করতেও আমরা রাজি হব না। একটি জাতি হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে যে সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে তার কৃতিত্ব অবশ্যই শেখ মুজিবকে দিতে হবে। ....আজ থেকে অনেক দিন পরে হয়ত কোন পিতা তার শিশুপুত্রকে বলবেন, জান খোকা! আমাদের দেশে একজন মানুষ জন্ম নিয়েছিল যাঁর দৃঢ়তা ছিল, তেজ ছিল..... । কিন্তু মানুষটির হৃদয় ছিল, ভালবাসতে জানতেন। দিবসের উজ্জ্বল সূর্যালোকে যে বস্তু চিকচিক করে জ্বলে তা হল মানুষটির সাহস। আর

জ্যোৎস্নারাতে রূপালী কিরণ ধারায় মায়ের স্নেহের মত যে বস্তু আমাদের অন্তরে শান্তি এবং নিশ্চয়তার বোধ জাগিয়ে তোলে তা হল তাঁর ভালবাসা। জান খোকা তাঁর নাম। শেখ মুজিবুর রহমান।"

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১-৭৫ এইচ.টি.ইমাম, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, আগস্ট ২০১৩।

২. বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (১, খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস)- সম্পাদনা অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯২।

৩. আহমদ, আবুল মনসুর (২০১৩) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৩।

৪. ইমাম, এইচ.টি (২০১৩) বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১-৭৫, ঢাকা, হাক্কানী পাবলিশার্স।

৫. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) (১৯৯২) বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (১ম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস)। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ।

৬. চৌধুরী, কবীর (সম্পাদিত) (২০১২) বঙ্গবন্ধু জন নায়ক থেকে রাষ্ট্র নায়ক। ঢাকা, অন্বেষা প্রকাশন।

৭. ছফা, আহমদ (২০১১) নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, ঢাকা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী।

৮. হাশিম, আবুল (২০০৭) তাঁর জীবন ও সময়। সম্পাদনা সৈয়দ মনসুর আহমদ। ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

৯. অধ্যাপক রশিদ, হারুন অর (২০১৩) বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পুনর্পাঠ। ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

১০. রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১৪) অসমাপ্ত আত্মজীবনী। ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

১১. সরকার, মোনায়েম (২০০১) বাঙালির কণ্ঠ। সম্পাদনা ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

12. Islam, Nurul (2005) Making of a Nation Bangladesh, An Economist's Tale. Dhaka: University Press Limited.

13. Karim, S.A (2014) Sheikh Mujib Triumph & Tragedy. Dhaka: University Press Limited.

14. Rahman, ndc, A.L.M Abdur (2011) Revisiting BCS Caders: Career Planning for Translational Leadership. M Phill Dessertation. Bangladesh University of Professionlas, Dhaka.

15. Rahman, Anisur (2007) Through Moments in History, Memoris of Two Decades of Intellectual and Social life (1970-1990), Dhaka: Pathak Shamabesh.

16. Razzak, Abdur (2010) Bangladesh State of the Nation. Dhaka:Shahitya Prakash.

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাঃ একটি বিশ্লেষণ

** অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন*

Abstract: *Planning is an ongoing process. It is constantly subject to evaluation, renovation, reformation, distortion. In this article an attempt has been made to find out the direction and the destination of our five year plan in Bangladesh at various regimes and times. This paper presents a brief discussion about the various goals, objectives and ideologies of first five year plan to seventh five year plan and overall the ultimate goals of the vision 2021 of the present government. An appraisal has also been made of the different regimes about shifting of their planning ideologies, norms, values of the government in power and socio economic, political and cultural environment of the society in general.*

বহুসংখ্যক অভীষ্ঠ লক্ষ্যের মধ্য থেকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় লক্ষ্যগুলো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সনাক্ত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জনের জন্য একদিকে সম্পদ আহরণ ও অন্যদিকে সম্পদের যুক্তিযুক্ত বিভাজনের নাম পরিকল্পনা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উন্নয়নে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অনুযায়ী সর্বোত্তমভাবে সম্পদ আহরণ করা, সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আহরিত সম্পদসমূহ সর্বোত্তমভাবে খাতওয়ারী ব্যবহার করা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষমাত্রাসমূহ অর্জন করা সম্ভব হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নানা ধরনের সমস্যা বিরাজমান এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সীমিত সম্পদ দিয়ে কিভাবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমস্যা সমূহের সমাধান করা যায় মূলত সেজন্যই উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে।

প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। অনুন্নত বা উন্নত দেশ সমুহের আয়, নিয়োগ, উৎপাদন ও দামস্থরের পরিবর্তন, উন্নয়ন হার অর্জন ইত্যাদি মুখ্য উদেশ্যসমুহ কোন সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার নিমিত্ত যে নীতিমালা সরকার গ্রহন করে তাকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।

অর্থনীতিবিদ Michael. P. Todaro বলেন, পূর্বনিধারিত এক গুচ্ছ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় প্রধান অর্থনৈতিক চলকসমূহকে (আয়, নিয়োগ, বিনিয়োগ ইত্যাদি) প্রভাবিত নির্দেশিত এবং এমন কি নিয়ন্ত্রন করার সরকারী উদ্দেশ্য প্রনোদিত প্রচেষ্টাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।

অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

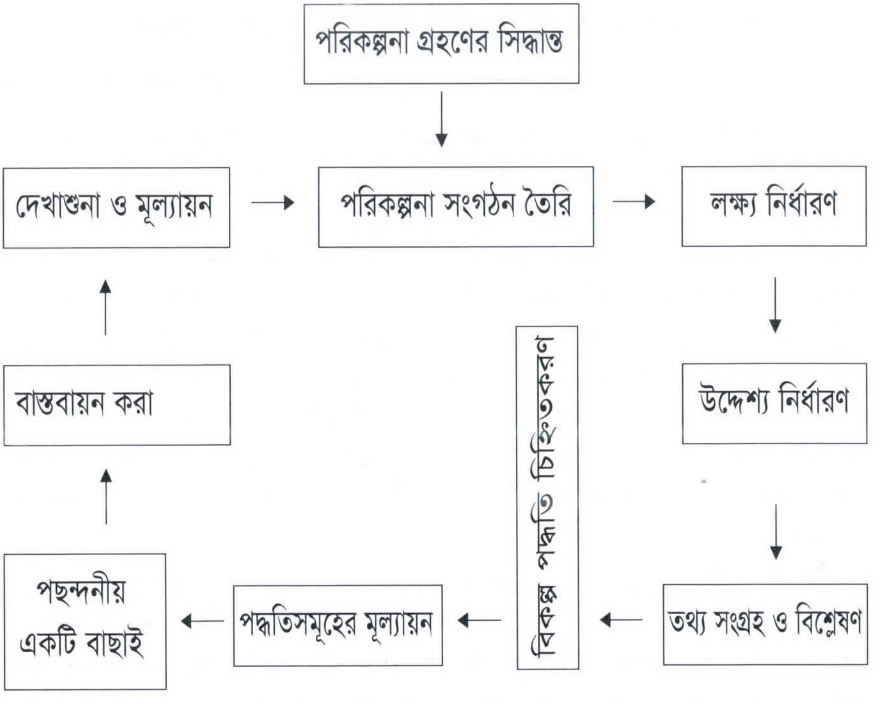

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হল অর্থনৈতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত। এ পরিকল্পনায় কতিপয় বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটে থাকে। প্রতিটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি সুপরিকল্পিত লক্ষ্য ও কর্মসূচি রয়েছে। কর্মসূচি ব্যতীত কোন পরিকল্পনা হতে পারে না। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আবিষ্কারের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ গতিশীল হয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক গতিশীলতা ফিরে আসে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায়। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থাকে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করে এবং কর্মপন্থা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সম্পদ ও মূলধনের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে। এবং এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সামাজিক কল্যাণকে বিবেচনায় নিতে হয়।

আঠারো এবং উনিশ শতকের বিশ্ব অর্থনীতি মূলত অবাধ বাজার ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের (১৯১৭) আগে প্রবৃদ্ধি বা আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কোন দেশে প্রচলিত ছিল না।

সামাজিক বৈষম্যরোধের জন্যই বস্তুত অর্থনীতিতে সরকারী হস্তক্ষেপের ধারণার উদ্ভব হয় এবং তৎসংগে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

১ সৈয়দ আব্দুস সামাদ, পরিকল্পনা (ঢাকা,পলস্নব প্রকাশনী) ১৯৯০, পৃ -৯

বলশেভিক বিপ্লবের অব্যবহিত পরে রাশিয়ায় যে আর্থ সামাজিক সংকটের সৃষ্টি হয় তা মোকাবেলা করার জন্যই সে দেশে পরিকল্পনার জন্ম হয়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য দেশসমূহে সামষ্টিক পরিকল্পনার শুরু ১৯৩০ সালের চরম অর্থনৈতিক মন্দার পর, কেন্দ্রীয় অর্থনীতির জন্মও লাভ করে এ মন্দা মোকাবেলা করার জন্য। তিরিশ দশকের চরম মন্দার সময় অবাধ বাজার ব্যবস্থা সাময়িকভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকেই অনুন্নত দেশসমূহ তাদের উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষনধর্মী আলোচনা শুরু করে। বস্তুত এসব আলোচনার প্রারম্ভিক প্রেক্ষাপট ছিল দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মূলত এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ বেছে নেয়। ইউরোপের মার্শাল প্লানের মত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মিলে ১৯৫০ সালে কলম্বো পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গ্রেট বৃটেনের উদ্যোগে নেয়া এ পরিকল্পনা অনুসারে সদস্য দেশগুলো নিজ নিজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ শুরু করে।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। সুষম অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বন্টনের দ্বারা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব। প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো জনগণের অর্থনৈতিক অভাব মোচন করা এবং সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা। সুতরাং যে কোন সুনিশ্চিত পরিকল্পনায় জনগণের কর্মসংস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দারিদ্র্য জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ মৌলিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ সরকারের মৌলিক উদ্দেশ্য বিধায় মৌলিক চাহিদা পূরন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারী উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিই এদেশের জনগণের আয়ের প্রধান উৎস। কৃষিকে বাদ দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন অসম্ভব। এদেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ উদ্দেশ্যে এদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে কৃষির পরই শিল্পের স্থান। শিল্পোন্নয়ন হলে জাতীয় আয় এর অবদান বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে ভারী শিল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন সাধন এদেশের অর্থ-পরিকল্পনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। সুষম অর্থ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা আসে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার

অন্যতম লক্ষ্য হল জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা বিধান অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য।

পঞ্চাশের দশক থেকেই বাংলাদেশ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পরিচিত। পাকিস্তান আমলের দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা রয়েছে বাংলাদেশের, যদিও তখন পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে এ দেশের কোন ভূমিকা ছিল না। পাকিস্তানের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরুর প্রাক্কালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি পরিকল্পনা বোর্ড ছিল যা পরে পরিকল্পনা বিভাগ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনের প্রাদেশিক দপ্তর হিসেবে কাজ করতো। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হবার সময় খুব স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান পরিকল্পনা বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনে আত্মীকৃত হয়। নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্য নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে পরিকল্পনাবিদগনের নিকট কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা না থাকায় তারা অসুবিধার সম্মুখীন হন।

এমন একটি অবস্থায় পরিকল্পনাবিদগন তাদের বিশ্বাস ও বিচারশক্তি অনুযায়ী সমাজের কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়নে নীতি প্রণয়ন করেন এবং এই নীতি সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের বিষয়টি রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর ছেড়ে দেন। একদিকে পরিকল্পনাবিদ প্রস্তাবিত নীতি ও অন্যদিকে তাদের অবস্থান আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব উভয়ের সংগে সংঘাতের সৃষ্টি করে।

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সকল জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ -১৫) অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে ৩১ জানুয়ারী ১৯৭২ সনে 'বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৬ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) 'পরিকল্পনা বোর্ড' গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সূচনা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পরিকল্পিত দ্রুত উন্নতি অর্জনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। সচিব পদমর্যাদার " প্রধান" এর অধীনে মোট ১০ টি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়: বিভাগসমূহ হচ্ছে সাধারন অর্থনীতি, কার্যক্রম ও মূল্যায়ণ, কৃষি, শিল্প, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান, ভৌত অবকাঠামো, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো, বহি:সম্পদ ও প্রশাসন। এ কমিশনকে সরাসরী সরকারি প্রধানের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

---

২ Rehman Sobhan and Muzaffer Ahmed, Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in the Political Economy in Bangladesh, 1980, page 114-116

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের কার্যপরিধিঃ

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থ সামাজিক উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয়, বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ;
- জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়ণ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ;
- পরিকল্পনার দক্ষতা মূল্যায়ন এবং জাতীয় পরিকল্পনা মূল্যায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনার বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ;
- গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর উপর সমীক্ষা পরিচালনা করা এবং অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বৈদেশিক-সাহায্য চাহিদা নিরূপণ এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের পরিমাণ এবং আঙ্গিক গঠন নিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আলোচনা;
- বৈদেশিক ঋণের মূল্যায়ন এবং এ বিষয়ে জাতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়নসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- অর্থনৈতিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রণোদনা প্রদান এবং কার্যকর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জরীপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ । জাতীয় পরিকল্পনা, বাষিক কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক নীতিমালার ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক অবকাঠামো সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ;
- প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া উজ্জীবিতকরন এবং প্রয়োজনবোধে প্রকল্প প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ, জাতীয় উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের পরীক্ষা এবং এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ;
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ ;
- দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা;
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাথে সম্পৃক্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়াবলী ; এবং
- পরিকল্পনার গুরত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়াবলী সম্পর্কে আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্য দূরীকরণ ।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে বাংলাদেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করা হয় । বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিনির্মান করা হয়েছে। সবগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভাষাগত কিছু ব্যবধান ছাড়া সবগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষসমূহ প্রায় সদৃশ ।

সারনি- ১: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত প্রবৃদ্ধি

পরিকল্পনা	পরিকল্পনা আকার			প্রবৃদ্ধি লক্ষমাত্র %	পকৃত প্রবৃদ্ধি %
	মোট	সরকারি	বেসরকারি		
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৪৪,৫৫০	৩৯,৫২০	৫,০৩০	৫.৫	৪.০
দ্বি বার্ষিক পরিকল্পনা	৩৮,৬১০	৩২,৬১০	৬০০০	৫.৬	৩.৫
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৭২.০০০	১১১.০০০	৬১,০০০	৫.৪	৩.৮
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৩৮৬০০০	২৫০,০০০	১৩৬,০০০	৫.৪	৩.৮
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৬২০,০০০	৩৪৭,০০০	২৭৩,০০০	৫.০	৪.১৫
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৫৯,৫২১	৮৫৮,৯৩৯	১১০০,৫৮২	৭.০	৫.৫
(docstoc)http://www.docstoc.com/docs/24202540/Five-Year-Plan-in-Bangladesh					

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩ সালে প্রণীত হয় (১৯৭৩-১৯৭৮)। যুদ্ধ বিধবস্ত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের নৈরাশ্যজনক প্রেক্ষাপটে এই পরিকল্পনার সূচনা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ ছিল রাষ্ট্রিয় অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তর করা। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছাড়া অন্যান্য সবগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থ সামাজিক লক্ষ্য হলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ও সংরক্ষন।

সারনি- ২: প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার ও সম্পদের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)

ধরন	মোট	শেয়ার%	সরকারি	শেয়ার%	বেসরকারি	শেয়ার%
পরিকল্পনা আকার	৪৪.৫৫	১০০	৩৯.৫৩	১০০	৫.০৩	১০০
অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২৬.৯৮	৬০	২২.৪৫	৫৭	৪.৫৩	৯০
বাহ্যিক সম্পদ	১৭.৫৭	৪০	১৭.০৭	৪৩	.৫০	১০

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এই পরিকল্পনার কিছু কাঠামো এবং বরাদ্দগত পরিবর্তন করা হয়। ফলে জন্ম নেয় একটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচী। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে সূচিত হয়। অনেকের মতে, এটি একটি অবাস্তব ও উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে এ দেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক নীতিমালা বাস্তবায়ন হচ্ছিল ধীরগতিতে কিছুটা সতর্কতার সাথে।

সারনি- ৩: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার ও সম্পদের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা) ১৯৮১-৮৫

ধরন	পরিকল্পনা আকার	শেয়ার%
সরকারি	১১১.০০	৬৪.৫০
বেসরকারি	৬১.০০	৩৫.৫০
মোট	১৭২.০০	১০০.০০

কিন্তু পরবর্তীতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশ্বব্যাংক ও দাতা গোষ্ঠীর চাপে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাপক বিকাশ ও সংরক্ষণের নিমিত্তে অর্থনৈতিক নীতমালা খুব দ্রুতগতিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা সমূহ এ সময়ে দেশে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় বিশ্ব ব্যাংক ও দাতা সংস্থার চাপে এ দেশে রাষ্ট্রীয়করণকৃত কলকারখানা, ব্যাংক বীমাসহ বিভিন্ন সেবাখাত ও বাণিজ্য ব্যাপক ভাবে বি-রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় । তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক (১৯৮৫-৯০) পরিকল্পনায় ৩৮,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হলেও প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ হয় ২৫,০০০ কোটি টাকা।

সারনি- ৪: তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার ও সম্পদের পরিমান (বিলিয়ন টাকা) ১৯৮৫-৯০

ধরন	মোট	শেয়ার%	সরকারি	শেয়ার%	বেসরকারি	শেয়ার%
পরিকল্পনা আকার	৩৮৬.০০	১০০	২৫০.০০	১০০	১৩৬.০০	১০০
অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৭৫.৭২	৪৫.৫২	৫৯.৬০	২৩.৮৪	১১৬.১২	৮৫.৩৮
বাহ্যিক সম্পদ	২১০.২৮	৫৪.৪৮	১৯০.৪০	৭৬.১৬	১৯.৮৮	১৪.৬২

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধিকরণ।
- গড়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৫ ভাগে আনয়ন ।
- জনসংখ্যার বৃদ্ধি ২.২ % থেকে ১.৯ % নামিয়ে আনা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ ।
- চরম দারিদ্র্য দূরীকরণে কর্মসূচি গ্রহণ ।
- অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ ।
- অভ্যন্তরীণ সম্পদের পর্যাপ্ত সরবরাহ বৃদ্ধি ।
- খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ।
- শিল্প সেক্টরে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ ।

সারনি- ৫: চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার ও সম্পদের পরিমান (বিলিয়ন টাকা) ১৯৯০-৯৫

ধরন	মোট	শেয়ার%	সরকারি	শেয়ার%	বেসরকারি	শেয়ার%
পরিকল্পনা আকার	৬২০.০০	১০০	৩৪৭.০০	১০০	২৭৩.০০	১০০
অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৩৪৫.০০	৫৬	১১৯.০০	৩৪.৩০	২২৬.৫	৮২.৯৬
বাহ্যিক সম্পদ	২৭৫.০০	৪৪	২২৮.০০	৬৫.৭০	৪৬.৫	১৭.০৪

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ছিল:

- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিকরণ ।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ।
- কাঠামোগত সংস্কার এবং বেসরকারীকরন নীতি ও কৌশল গ্রহণ ।
- সামগ্রিক মানব সম্পদ উন্নয়নের কৌশল গ্রহণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ।
- শস্য উৎপাদনে স্বংয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ।
- সবার জন্য শিক্ষা নীতি গ্রহণ ।
- দলগত ভূমিকা এবং অংশগ্রহণমূলক কার্যের মাধ্যমে সাংগঠনিক, ব্যবস্থাপনা কার্যের উন্নয়ন ।

সারনি-৬ : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার ও সম্পদের পরিমান (বিলিয়ন টাকা) ১৯৯৭-২০০২

ধরন	মোট	শেয়ার%	সরকারি	শেয়ার%	বেসরকারি	শেয়ার%
পরিকল্পনা আকার	১৯৫৯.৫২	১০০	৮৫৮.৯৪	১০০	১১০০.৫৮	১০০
অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৫১৯.৭৬	৭৭.৫৬	৫২৭.৭২	৬১.৪৪	৯৯২.০৪	৯০.১৪
বাহ্যিক সম্পদ	৪৩৯.৭৬	২২.৪৪	৩৩১.২২	৩৮.৫৬	১০৮.৫৪	৯.৮৬

সারনি- ৭: বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার অর্থনৈতিক সূচক ও লক্ষমাত্রা

	ব্যঞ্চমার্ক /২০০৯	টার্গেট / ২০১৫	টার্গেট / ২০২১
বাৎসরিক প্রকৃত জি ডি পি প্রবৃদ্ধিও হার %	৬.১	৮.০	১০.০
জি ডি পির %			
মোট বিনিয়োগ	২৪.৪	৩২.৫	৩৮.০
মোট জাতীয় সঞ্চয়	৩০.০	৩২.১	৩৯.১
মোট সরকারী রাজস্ব	১০.৯	১৪.৬	২০.০
মোট সরকারী বিনিয়োগ	১৪.৬	১৯.৬	২৫.০
রপ্তানী (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	১৬.২	৩৮.৮	৮২.০
আমদানী (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	২১.৪	৫২.৮	১১০.৫
র‍্যামিটান্স (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	১০.৯	১৭.৮	৩৮.৫
সি পি আই মুদ্রাস্ফিতী (%)	৭.৫	৬.০	৫.২
ছন্দ্ব বেকারত্বের হার	৩০.০	২০.০	১৫.০
দারিদ্র্য (মাথা গননা %)	৩১.৫	২২.৫	১৩.৫

Source: Perspective Plan of Bangladesh 2010-21: Making Vision 2021 a Reality.

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ বাস্তবায়িত হবে দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে, যথা

১) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১০-১৫

২) সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৬-২০

সারনি- ৮: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১১-১৫: লক্ষ্যমাত্রা (*বিকল্প জি ডি পি প্রবৃদ্ধি চিত্র (ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা)

প্রবৃদ্ধি চিত্র	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১১-১৫ গড়
Baseline Scenario	৬.৩	৬.৪	৬.৭	৬.৯	৭.১	৬.৭
Medium Policy Shift Scenario	৬.৫	৬.৭	৭.০	৭.৫	৮.০	৭.২
High Policy Shift Scenario	৬.৫	৭.২	৮.০	৮.৫	৯.০	৭.৮

সারনি- ৯: *সেক্টোরাল প্রবৃদ্ধির অগ্রগতি (ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা)

সেক্টর	২০০৮-০৯	২০১১-১৫ Baseline	২০১১-১৫ Mid Policy Shift	২০১১-১৫ High Policy Shift
কৃষি	৩.৪	৩.৫	৪.১	৪.৪
শিল্প	৭.২	৮.২	৮.৫	৯.১
সেবা	৬.১	৭.০	৭.৪	৭.৯
জি ডি পি	৫.৯	৬.৭	৭.২	৭.৮

সারনি- ১০: *বিভিন্ন পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ অর্থনীতির কর্মসম্পাদন প্রবৃদ্ধি

পরিকল্পনা	জি ডি পি প্রবৃদ্ধি টার্গেট %	প্রকৃত প্রবৃদ্ধি %
১ম পঞ্চবার্ষিকী পনিকল্পনা(১৯৭৩-৭৮)	৫.৫	৪.০
দ্বী-বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)	৫.৬	৩.৫
২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)	৫.৪	৩.৮
৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)	৫.৪	৩.৮
৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)	৫.০	৪.২
৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)	৭.০	৫.২
২০০৩-০৫	-	৫.৫
২০০৬-০৯	-	৫.৩

*Sixth Five Year Plan of Bangladesh (2011-15), paper presented by Dr.Muhammad G.Sarwar, 14 June 2011

- ২০১৩ সালের মধ্যে জাতীয় গড় বার্ষিক বৃদ্ধির মাত্রা ৮ শতাংশ সুরক্ষিত এবং বজায় রাখা এবং ২০১৭ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা।
- ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্যসীমার নিচের মানুষের প্রতিকূলতা ১৫ শতাংশ নিচে নিয়ে আসা।
- ২০১২ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ।
- ২০২১ সালের মধ্যে সব দরিদ্র মানুষের জন্য মাথা প্রতি সর্বনিম্ন ২.১২২ কিলো ক্যালরি এবং অন্তত ৮৫ শতাংশ মানুষের খাদ্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করা।
- ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০ ভাগ তালিকাভুক্তি নিশ্চিতকরা, ২০১৩ সালের মধ্যে ডিগ্রী পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষাদান প্রদান, ২০১০ সালের মধ্যে পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জন, এবং বাংলাদেশকে তথ্য প্রযুক্তির দক্ষতার সাথে শিক্ষিত মানুষের দেশ হিসেবে পরিচিত করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করা।
- ২০১৫ সালের মধ্যে সমগ্র জনসংখ্যার জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করা, ২০১১ সালের মধ্যে সমগ্র জনসংখ্যার জন্য পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং ২০১৩ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন অধীন প্রতিটি ঘর গড়ে তোলা।
- ২০২১ সালের মধ্যে সব ধরণের সংক্রামক রোগ দূর করা এবং নাগরিকের ৭০ বছর পর্যন্ত আয়ু বৃদ্ধি করা।
- ২০২১ সালের মধ্যে ১.৫ শতাংশ প্রসবকালীন মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, ৮০ শতাংশ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার নিশ্চিত করা, এবং প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যু ১৫ জনে কমিয়ে আনা।
- ২০২১ সালের মধ্যে কৃষিতে ১৫ শতাংশ, শিল্পে ৪০ শতাংশ এবং সেবায় ৪৫ শতাংশ সেক্টরভিত্তিক ফলাফল পরিবর্তন করা।
- ২০২১ সালের মধ্যে কৃষিতে ১৫ শতাংশ, শিল্পে ৪০ শতাংশ এবং সেবায় ৪৫ শতাংশ বেকারত্ব হার কমিয়ে আনা।
- ২০১৩ সালের মধ্যে ৭০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, ২০১৫ সনে ৮০০০ মেগাওয়াটে উত্তীর্ণ এবং ২০২১ সালে ২০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা ।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে সুশাসন উন্নয়নের প্রচেষ্টা হিসেবে নিন্মের বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে :

- সংসদীয় প্রক্রিয়াকে কার্যকরীকরণ ।
- স্থানীয় প্রশাসনকে শক্তিশালীকরণ ।
- সরকারী সেবাকার্যের পুনর্গঠন ও সংস্কার।
- দূর্নীতি দূরীকরণ।
- নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরন।

- বিচারবিভাগীয় সংস্কার ।
- ই- গভর্নেন্স ।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ।
- সেক্টরাল গভর্নেন্স এর উন্নয়ন ।
- স্বচ্ছতা ও তথ্য প্রাপ্তি ।
- মানব অধিকার সুরক্ষাকরণ ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যর সাথে সঙ্গতি রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে নতুন কৌশল নির্ধারন, প্রতিষ্ঠান তৈরী ও নীতি গ্রহন করা যাতে ২০২১ সনের মধ্যে সরকারের সামাজিক ও অথনৈতিক সুফল অর্জনের যথাযথ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় । সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যপ্তিকাল হবে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত । সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিসহ উচ্চ বিলাসী কিছু লক্ষ্য রয়েছে যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সংস্কার, মুদ্রাস্ফিতী কমানো এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠাকরন । সরকার উক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক কৃষি অর্থনীতিকে আধুনিক ও নগর ভিত্তিক উৎপাদনশীল ও সেবা মূলক অর্থনীতিতে রুপান্তর করতে চায় । শিক্ষা ক্ষেত্রে বলা হয় যে আগামী ২০২০ সনের মধ্যে মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে । এ পরিকল্পনায় চলতি অর্থবছরে ৭ শতাংশ জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির লক্ষমাত্রা এবং পরবর্তী অর্থবছরে ৭.২ শতাংশ, ২০১৭-১৮ সনে ৭.৪ শতাংশ, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭.৬ শতাংশ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছয়টি ইস্যুতে গুরত্ব আরোপ করে :

- প্রযুক্তিজ্ঞান ভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- বিদ্যুৎ, শক্তি ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে অবকাঠামো সীমাবদ্ধতা দূরীকরন;
- কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝাড়ি শিল্প উন্নয়ন কৌশল নির্ধারন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল রপ্তানীর কৌশল নির্ধারন;
- সরকারী বেসরকারী বিনিয়োগের গতিশীলতা আনয়ন;
- রপ্তানী বৃদ্ধি করনে উৎপাদনের বিভিন্নতা নির্ধারন ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ

পরিকল্পনাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতে নীতি নির্ধারণ বা কর্মসূচি প্রণয়নের ত্রুটি নয় বরং বাস্তবায়নের অদক্ষতার কারণেই উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হয় । বাংলাদেশের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে বাস্তবায়নজনিত অসুবিধা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান সমস্যা বলা যায় । A recent World Bank study outlines the principal dimensions of

governance or institutional quality that includes: voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corruption..[3]

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সঠিক প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়টি জড়িত রয়েছে সুশাসনের উপর। বিশ্বব্যাংক সুশাসন এর পরিমানগত নির্দেশক হিসেবে নিম্মের তিনটি আঙ্গিক উল্লেখ করেন যথা:

- The political dimension, which is indicated by the two indexes namely, voice and accountability and political stability, relates to the process by which governments are selected, monitored and replaced.
- The economic dimension, which is also indicated by two indexes, viz, government effectiveness and regulatory quality, represent the ability of the government to design and execute policies and deliver public services.
- The institutional dimension of governance is summarized by the rule of law and control of corruption.

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন একদল বিশেষজ্ঞ পরিকল্পনাবিদ। যারা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে আয়, উৎপাদন, নিয়োগ, লোকসংখ্যা ও বাণিজ্যিক অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে। বাংলাদেশে এ সমস্ত দক্ষ বিশেষজ্ঞের অভাব রয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধকতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞের অভাবে সঠিক ও নির্ভুল পরিকল্পনা প্রণয়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। দক্ষ বিশেষজ্ঞরা সঠিক ও উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়নে পারদর্শী। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ আবশ্যক। বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে নির্ভুল পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হয়। বিশেষজ্ঞের পাশাপাশি অর্থনীতিবিদরা পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। বিচক্ষণতার মাধ্যমে তারা বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা করতে সক্ষম। সুতরাং এ সমস্যার সমাধানে অর্থনীতিবিদ নিয়োগ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে অর্থনেতিক পরিকল্পনার প্রথম সমস্যা হল পর্যাপ্ত এবং নির্ভুল পরিসংখ্যানের অভাব। এদেশে পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য নির্ভুল নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য তাই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান দরকার। সঠিক তথ্য সংগ্রহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্যার প্রথম সমাধান। বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে নির্ভুল তথ্যের অভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে বাঁধার সৃষ্টি হয়। এ লক্ষ্যে খাতওয়ারী সঠিক তথ্য সংগ্রহ আবশ্যক।

বাংলাদেশে আয় ও সঞ্চয়ের স্বল্পতার জন্য অভ্যন্তরীন মূলধন গঠন খুবই কম হয়।

3 Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M (2005). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, Policy Research Working Paper 5430, The World Bank: Washington DC.

অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে ঘাটতি বা অনিশ্চয়তা দেখা যায়। সুতরাং প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের ফলে জাতীয় সঞ্চয় কম হয় এবং মূলধন গঠন করা কষ্টকর। ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। মূলধন বৃদ্ধির মাধ্যমে এদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথকে সুগম করা যায়। মূলধন হল অর্থনেতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি গুরত্বপূর্ণ উপাদান। মূলধন হল অর্থনেতিক কর্মকান্ড পরিচালনার মূল চাবিকাঠি। এদেশে মূলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিৎ।

অনুন্নত দেশে বিশেষত বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান। এর ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহনশীলতাও কম যা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে চাঁদাবাজী, মাস্তানীসহ বিভিন্ন কার্যকলাপের দ্রুত বিস্তৃতি ঘটায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এই অবস্থা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, বণ্টন ব্যবস্থার প্রতি হুমকি যা পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পথে একটি অন্যতম মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা বলা যায়। সুষম পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজন স্থিতিশীল সরকার ও দলীয় ঐক্যমত। তবে পরিকল্পনায় সফলতা আসবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পদ ও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে অনেকাংশে সামঞ্জস্যহীন ও উচ্চাভিলাষী। এজন্য মাঝামাঝি সময়েও পরিকল্পনার আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। এর দরুন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সামাজিক প্রতিকূল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কারণে অনুন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ রক্ষণশীল ও উন্নয়ন বিমূখ হয়। ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয়। পরিকল্পনা সমস্যার সমাধানের অন্যতম উপায় হল বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন। এদেশে প্রণীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনেকটা অবাস্তব। ফলে এটি বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। তাই আর্থিক ক্ষমতার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি খাতে অদক্ষতা বিরাজমান। বিগত বৎসরগুলোতে এসকল খাতে অধিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পরিকল্পনার সমস্যাবলী উত্তরণের অন্যতম পদক্ষেপ। প্রশাসন দক্ষ না হলে উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় না। প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে এটি সম্ভব। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে। বেসরকারি খাতের তুলনায় সরকারি খাতে লোকসান ও অপচয় বেশী। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সরকারের অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন পরিকল্পনায় বেসরকারি খাতকে অবজ্ঞা করা হয়। এতে বেসরকারি খাতের গতিশীলতা বিঘ্নিত হয়। বেসরকারীকরণের মাধ্যমে সুষম অর্থপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব। বেসরকারিকরণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতিবন্ধকতা হ্রাসের অন্যতম উপায়। বেসরকারিকরণের মূল উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন। যতবেশি মুনাফা অর্জন সম্ভব তত

বেশি উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়নও সম্ভব । এক্ষেত্রে অপচয়ও রোধ হয় ।

দূর্নীতি বাংলাদেশের একটি প্রকট সমস্যা । বিশেষ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা দূর্নীতিতে লিপ্ত থাকে । দূর্নীতির কারণে কাজে জটিলতা ও কালক্ষেপণ হয় । ফলে সঠিক সময় সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় না । প্রশাসন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিযুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায়পরায়ন হওয়া উচিত । এক্ষেত্রে নিজের স্বার্থকে উপেক্ষা করে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে । ঘুষ ও দূর্নীতি মুক্ত পরিবেশ সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে ।

উপসংহার:

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পদ ও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে অনেকাংশে সামঞ্জস্যহীন ও উচ্চ ভিলাষী । এজন্য মাঝামাঝি সময়েও পরিকল্পনার আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয় । এর দরূন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না । অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সামাজিক প্রতিকূল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কারণে অনুন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ রক্ষণশীল ও উন্নয়ন বিমূখ হয় । ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয় । পরিকল্পনা সমস্যার সমাধানের অন্যতম উপায় হল বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন । সেজন্য আর্থিক ক্ষমতার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য ।

পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্যা সমাধানের উপায় । এসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পরিকল্পনা প্রণয়নের পথ সুগম হবে । এগুলোর কোন একটিকে বাদ দেয়া চলে না । এসকল পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে ।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

আহমেদ, নাসিরউদ্দিন ও তারেক, মোহাম্মদ, সম্পাদিত উন্নয়ন অর্থনীতি বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ ।

সামাদ, সৈয়দ আব্দুস পরিকল্পনা ,পল্লব প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০

Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M (2005) The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, Policy Research Working Paper 5430, The World Bank: Washington DC.

Perspective Plan of Bangladesh 2010-21: Making Vision 2021 a Reality

Sobhan, Rehman and Ahmed, Muzaffer (1980) Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in the Political Economy in Bangladesh, 114-116

পিটার সিঙ্গার এর নৈতিক মডেলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনঃ ত্রিমাত্রিক মডেলের প্রাসঙ্গিকতা

ড. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া[১]

Abstract: *Throughout the article, it has been shown that moral conscience and economic growth are essential for poverty alleviation. To reach into this goal, this article has examined Peter Singer's ethical model of poverty alleviation. But, we find his theory as a trivial and ethically bias notion. Moreover, his analysis would help us to conceptualize the identification point of poverty alleviation. In keeping mind this hypothesis, I offered a triad model of poverty and hunger alleviation which constitutes of three levels: at the first level, the model incorporates Kant's rational approach, Bentham notion of utilitarianism and Singer's notion of reverse utilitarianism. At the second level, it intends to incorporate social values, equality, commitment to people, ensuring entitlement, and provide sufficient incentive to the poor people. And, at the final stage, it incorporates the Marxist equal distribution policy and Sen's capability functionalism. By following this new model, it is possible to alleviate poverty and hunger in a large-scale.*

ভূমিকা

যারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে তাদের প্রতি ধনীদের দায়িত্ব কী। মানুষের প্রতি মানুষের মর্যাদা প্রদর্শন, মানবাধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ এসব মিলিয়ে যে প্রশ্নটির উদ্রেক করে তা হলো ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কি মানুষের জীবনমূল্যেও স্খলন নয়। এসব প্রশ্ন নিয়ে নীতিদর্শনে ও কল্যাণ অর্থনীতিতে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। এইসব ভাবনার ফসল হিসেবে অর্থনীতিবিদ, পলিসি বিশেষজ্ঞ ও নীতিদার্শনিকগণ ভাবছেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কীভাবে দূর কর যায়। মানুষের খাদ্য বিষয়ক প্রযুক্তি, উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেলেও এখনও সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষ বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছে। গত পাঁচ দশকে গোটা পৃথিবীর দরিদ্র্য মানুষের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে নাটকীয়ভাবে। প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ বেঁচে থাকার জন্য এক বোতল পানির সমমূল্যের অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতার কারণে প্রতিবছর মারা যাচ্ছে প্রায় দশ মিলিয়ন শিশু। চরমভাবে দারিদ্রের মধ্যে বাস করছে প্রায় ৮৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ। উক্ত জনগোষ্ঠীর দৈনিক আয় ১.২৫ ডলারের চেয়েও কম। জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রায় (এসডিজি) দাবি করছে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বের করে আনতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এ লক্ষ কীভাবে অর্জিত হবে। উন্নত বিশ্বের অনুদান কিংবা সাহায্যের মাধ্যমে, নাকি নিজেদের সার্মথ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে। যদি সাহায্যের প্রসঙ্গ আসে তাহলে এ সম্পর্কিত বিতর্ককেও পাশ কাটানোর সুযোগ নেই। উন্নত বিশ্বের জনগণ দারিদ্র্য জাতিগোষ্ঠীকে সাহায্য করবে কি-না এটা একান্তই তাদের

1 Singer, Peter, 2009, The Life You Can Save: How to Do Your Part to End World Poverty, New York : Random House Publishing Co.

[১]অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

পছন্দের বিষয়। আবার এটাও দাবি করা হচ্ছে যে, উন্নত বিশ্বের জনগণ যদি পৃথিবীর গোটা জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তবেই কেবল ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান সম্ভব। সর্বোপরি ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সমকালীন বিশ্বের এক জটিল সংকট। এই সংকট নিঃসন্দেহে মানবতারও সংকট। এই সংকটের কারণ ও উত্তরণের বিস্তৃত আলোচনা নিয়ে পিটার সিঙ্গার লিখেছেন : The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty। প্রবন্ধে ক্ষুধা দারিদ্র্য বিষয়ক কয়েকটি বিতর্কের পাশাপাশি পিটার সিঙ্গার প্রস্তাবিত মডেলটি নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। পরিশেষে সিঙ্গার প্রস্তাবিত মডেলের সীমাবদ্ধতাসমূহ উল্লেখ থাকে তা কীভাবে অতিক্রম করা যায় সে প্রসঙ্গে বহুত্ববাদী নৈতিক সিদ্ধান্তের সমন্বয়ে একটি মডেলের প্রস্তাব করা হবে।

দুই

কেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য

প্রথমেই যে প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে, তা হলো: ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কী মানব সৃষ্ট। নাকি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রকৃতিতে অনেক ঘটনা ঘটে যার উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন, ভূমিকম্প, সুনামি, ঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কী সেরকম কোনো ঘটনা। এ প্রশ্নের একটি যুক্তিযুক্ত বিশেস্নষণের পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কেন হয়। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণসমূহ জানার ক্ষেত্রে আমরা সমালোচনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারি।

আলোচনার সুবিধার্থে তাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদগণ যেসব কারণে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সংঘটিত হয় বলে দাবি করেন সংক্ষেপে তা নিচের ডায়াগ্রামে দেখানো যেতে পারে:

ডায়াগ্রাম ১: ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণসমূহ

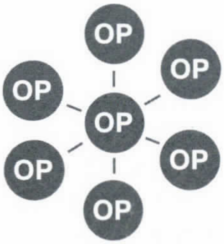

CPH : causes of poverty and Hunger (ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণসমূহ)

OP : (over population) অতিরিক্তি জনসংখ্যা

PE: (problems of entitlement) স্বত্বাধিকারের সমস্যা

FH : (food habit) খাদ্যাভ্যাস

SIJ : (social injustice সামাজিক অবিচার বা অন্যায়

C: (corruption) দুর্নীতি

ID : (income deprivation) আয়-বঞ্চনা

প্রথমত, অতিরিক্ত জনসংখ্যা (over population): অনেক তাত্ত্বিকই মনে করেন, গরীব দেশসমূহের ক্ষুধা দারিদ্রের কারণ হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা। এমনকি অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বিদেশী সাহায্যও যথাযথভাবে কাজ করে না। অতিরিক্ত জনসংখ্যা

সীমিত সুবিধাদির উপর ভাগ বসায়, আর সীমিত সুবিধাদি বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে বণ্টন হয়ে যাবার ফলে জীবন মূল্যমানের অধোগতি হয়। এই অধোগতির কারণে প্রথমত ঐ জনগোষ্ঠী তাদের খাদ্য চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদি যেমন, স্বাস্থ্যসুবিধা, শিক্ষা সুবিধা বাসস্থানসহ জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনসমুহ অধিক সংখ্যক মানুষের মধ্যে বণ্টিত হয়। এতে করে জীবনের গুণগত মানের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। অনেকসময় অতিরিক্ত জনসংখ্যার অনুপাতে কর্মসংস্থানের হারও সমন্বয় করা যায় না। ফলে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠী খাদ্যের উপর স্বত্বাধিকার সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। স্বত্বাধিকার ব্যর্থতার ফলেই অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত সমাজের দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ১৯৪৩ এর বাংলার মনন্তর নিয়ে উইনস্টন চার্চিল একই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ৪৩ এর মনন্তরের মুল কারণ হলো: ''নেটিভদের খরগোশের মতো বংশবৃদ্ধির প্রবণতা''।

দ্বিতীয়ত, খাদ্যাভ্যাস: তাত্ত্বিক ও রাজনীতিবিদগণ দাবি করেন, জনগণের খাদ্যাভ্যাসও ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণ। এ দাবিটি আমরা লক্ষ করি আইরিশ দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সেই সময়কালের বৃটিশ সরকারের কোষাধ্যক্ষ চার্লস এডওয়ার্ড ট্রেভেলিয়নের মন্তব্য থেকে। তিনি আয়ারল্যান্ডের দুর্ভিক্ষের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখেন, আইরিশদের আলু খাবারের প্রতি অতি-আসক্তি দুর্ভিক্ষের কারণ। আলু খাবারের প্রতি এই প্রবণতার ফলে তারা এক ফসলী (শুধু আলু) কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল ছিল। আলু নিয়ে ট্রেভেলিয়ন বলছেন, ''কৃষকদের মধ্যে পশ্চিম আয়ারল্যান্ডের এমন স্ত্রীলোক বিরল যার রন্ধন কৌশল আলু সিদ্ধ করার চেয়ে বেশি কিছু জানে।'' আইরিশ দুর্ভিক্ষ সংঘটনের ঘটনায় এ মন্তব্য প্রমাণ করে তাদের জীবন যাপনে আলু-খাদ্যের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো প্রত্যাশা নেই।

দুর্ভিক্ষ সংঘটনকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আলু উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে কৃষকরা প্রথম কর্মহীন হয়ে পড়ে, আর উৎপাদন কম হবার কারণে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। আর আলু-প্রীতির কারণে অন্যান্য ফসল উৎপাদনের দিকে তাদের কখনোই তেমন কোনো ঝোঁক ছিল না। এসব কারণ দেখিয়ে ট্রেভেলিয়ন রিপোর্ট দাবি করে বিশেষ প্রকার খাদ্যাভ্যাস এই দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল।

এসব তাত্ত্বিকদের মধ্যে গ্যারেট হার্ডিন এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেখুন :

Hardin, Garret, 1968. "The Tragedy of the Commons", in Scince, Vol.162. pp.1243-1248.

Hardin, Garret, 1985. Living on a Lifeboat", in White, James E., (ed.), Comtemporary Moral Philosophy, New York: West Publishing Company, pp.115-128.

Sen, Amartya, 1999. Development As Freedom, Oxford: Oxford University Press.

এ সম্পর্কিত তথ্যের জন্ন দেখুন : Smith, Woodham,1962. The Great Hunger: Ireland 1845-1849, Londonn: Hamish Hamilton, p.76.

Sen, Amartya, 1999. chap. Seven : "Famine and other Crisis"

খাদ্যাভ্যাসই কী দর্ভিক্ষের কারণ। এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বৃটিশ উপনিবেশের প্রতিনিধি ট্রেভেলিয়ন যে তথ্যের ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষের কারণ দেখিয়েছেন তা যথার্থ নয়। এ বিতর্কে অমর্ত্য সেনের অভিমত হলো: বৃটিশদের বক্তব্য দায়িত্বহীন। বৃটিশ উপনিবেশিত অর্থনৈতিক পলিসিই আয়ারল্যান্ডের দুর্ভিক্ষের কারণ। এই অর্থনৈতিক পলিসির আওতায় আইরিশদের খাদ্য ও বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর আত্মনির্ভরশীলতার কেনো সুযোগ ছিল না। খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ট্রেভেলিয়ন যা বলেছেন তাও তথ্যভিত্তিক নয়, কারণ আইরশিদের স্বল্প আহারী প্রবণতা সর্বত্র জানা। তাদের খাদ্য মেন্যুতে যা থাকে তা খুবই পরিমিত। আইরিশ দুর্ভিক্ষর দায়ভার এড়ানোর বৃটিশ অপচেষ্টারই একটি অংশ হলো খাদ্যাভ্যাসকে দায়ী করা। সেসময় আয়ারল্যান্ড কোনো খাদ্য আমদানি দূরের কথা, উল্টো আয়ারল্যান্ড থেকে উচুঁজাতের খাদ্য সম্ভার ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা হতো। এসব তথ্যের আলোকে সেন দাবি করেন, দুর্ভিক্ষর কারণ খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং মন্দা অর্থনীতিই দায়ী ছিলো। অর্থনীতিতে মন্দার কারণে ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা মারাতকভাবে হ্রাস পায়। সংকুচিত হয় খাদ্য সরবরাহ। স্বস্থানের খাবার অধিক মূল্যে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। আর স্থানীয় পর্যায়ে দেখা দেয় খাদ্যের অপ্রতুলতা, সৃষ্টি হয় ক্রয়-ক্ষমতার অক্ষমতা। আয়ারল্যান্ডের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

তৃতীয়ত. সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব (deficiency of social justice): সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাবকেও দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যে সমাজে সামাজিক ন্যায়বিচার নেই, সেখানে খাদ্য মজুদ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যমূল্য ও জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে না। সামাজিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান অবিচার দারিদ্র্য সৃষ্টি করে। আর উচ্চমূল্যের বাজারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বত্তাধিকার থাকে না বিধায় তারা ক্ষুধার শিকার হয়। এভাবেই সামাজিক অবিচার ক্ষুধা ও দারিদ্রের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পারিভাষিক ও সংজ্ঞাগত দিক থেকেও বলা হয় খাদ্যের অভাবই দুর্ভিক্ষ। পারিভাষিক দিক থেকে তা সঠিক হলেও তত্ত্ব ও বস্তুনিষ্ঠ উপাদান ভিন্ন কথা বলে। এপ্রসঙ্গে আমরা ১৯৪৩ ও ১৯৭৪ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ, ১৯৭২ সালের ইথোপিয়ার উলু ও হারেরঘে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। এসব দুর্ভিক্ষের ঘটনার বর্ণনায় অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই বলেন, খাদ্যের অভাব দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ নয়। ৪১ ও ৪৩ এর বাংলার খাদ্য যোগানের তথ্যের সাহায্যে অর্থনীতিবিদগণ দেখান, ১৯৪১ সালে বাংলায় খাদ্য যোগান যা ছিল ১৯৪৩ সালে সেই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ৯ শতাংশ। অথচ ১৯৪১ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়নি। দুর্ভিক্ষ হয়েছে ১৯৪৩ সালে। সেসময় লক্ষ করা গিয়েছে ভূমিহীন কৃষক ও মৎস্যচাষীদের মতো নিম্ন আয়ের লোকজন দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল।

একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, যুদ্ধকালীন সমৃদ্ধি-স্ফীতি, অন্যদিকে বণ্টনে বৃটিশদের অসম নীতির কারণে নিম্ন আয়ের মানুষজন আক্রান্ত হয়। সমৃদ্ধি-স্ফীতির সঙ্গে

যুক্ত হয়েছিল খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি, চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি। আবার যুদ্ধের কারণে খেটে খাওয়া মানুষজন কর্মক্ষেত্রে যেতে নিরাপত্তা পায়নি। খেটে খাওয়া মানুষের কাজের সঙ্গে সুযোগেরও সমন্বয় ছিল না। অন্যদিকে নাগরিক সম্প্রদায়ের জন্য তখন রেশনের ব্যবস্থা করা হলেও গ্রামের মানুষজন সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। একই ঘটনা আমরা লক্ষ করি ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত খাদ্য যোগানের হিসেব থেকে দেখা যায় । ১৯৭৪ সালে মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। অথচ দুর্ভিক্ষ হয়েছে ১৯৭৪ সালে। এসময়ের দুর্ভিক্ষে মূল কারণই হলো অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর খাদ্য সংগ্রহের সুযোগে অনুপ্রবেশের বাধা। এই বাধার পেছনের কারণ হলো কর্মঘাটতি ও অর্থনৈতিক মন্দা। কর্মঘাটতি ও অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির কারণ ছিলো সামাজিক বাস্তবতা, মজুদদারি ও ন্যায়বিচারের অভাব। এসব কারণে এসময় পর্যাপ্ত খাদ্য থাকা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ হয়। বাড়তে থাকে গ্রামীণ জীবনে দারিদ্রের আনুপাতিক সংখ্যা ।

চতুর্থত. দুর্নীতি (Corruption): সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব যেমন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণ, তেমনি দুর্নীতিও একটি সামাজিক অবিচার। সামাজিক অবিচার অর্থনৈতিক বণ্টনে প্রভাব ফেলে, প্রকারান্তরে তা দুর্ভিক্ষকে অনিবার্য করে তোলে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) দুর্নীতিতে শীর্ষ তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডসমূহ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির কারণে সেখানকার জনগণ রাষ্ট্রীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বঞ্চনাসমূহ তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কাজকর্মে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অন্যদিকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষপ্রাপ্ত বিদেশী সাহায্য দুর্নীতির কারণে যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয় না। রাজনৈতিক দুর্নীতির কারণেও দারিদ্র্য বিমোচনসহ অন্যান্য লক্ষ্য বরাদ্দ বিদেশী অর্থনৈতিক সহযোগিতাসমূহের অপব্যবহার হয়। তন্মধ্যে রয়েছে অপরিকল্পিত প্রকল্প, প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা ও দায়বদ্ধতার অভাবের কারণে বিদেশী সাহায্যের অপচয় হয়ে থাকে। এইসব ফাঁক ফোকড়ের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি কোনো কাজেই আসে না।

নানা পরিপ্রেক্ষিত থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে দুর্নীতিকে দায়ী করা যায়। সমাজে অর্থনৈতিক বণ্টন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় যদি সুনীতি না থাকে, স্বজনপ্রীতি ও গোষ্ঠীপ্রীতি সক্রিয় থাকে, সেখানে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচারের পরিবর্তে দুর্নীতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। দুর্নীতিকে অনেক সময় সংক্রামক ব্যাধির সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। সংক্রামক ব্যাধি যেমন একজন থেকে আরেকজনে সংক্রমিত হয়, দুর্নীতিও সেরকম। একটি ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্থ হলে অন্য কাঠামো ও ব্যবস্থাসমূহও আক্রান্ত হয়। এভাবে দুর্নীতি একটি রাষ্ট্রের গোটা প্রক্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

---

৬ Sen, Amartya, 1999. chap. Seven : "Famine and other Crisis".

৭ ''ভারতীয়দের খরগোশের মতো জনসংখ্যা বৃদ্ধি''

পঞ্চমত, আয়-বঞ্চনা (income deprivation): সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ রয়েছে। নিম্ন-আয়ের মধ্যে রয়েছে দিন-মজুর, রিক্শাচালক, পাট-শ্রমিক, পোষাক শ্রমিক ও জেলে সম্প্রদায়। অন্যদিকে রয়েছে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, ও অতি-উচ্চবিত্ত। বাংলাদেশ এর সাপেক্ষে লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন বিত্ত ও পেশার মানুষের মধ্যে মাসিক আয়ে ব্যাপক তারতম্য। এই তারতম্য এতোটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে, নিম্ন আয়ের মানুষজনদের দিনাতিপাত করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। অন্যদিকে উচ্চবিত্ত শ্রেণির বিলাস, অপচয় আরো ধনী হয়ে ওঠার বাস্তবতাও রয়েছে। আয়-বৈষম্যের এই ধরনের কারণে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠে, অর্থনৈতিকভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না বঞ্চিত এইসব মানুষজন। এই বঞ্চনার মধ্য দিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য আরো তীব্র আকার ধারণ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক কারণ রয়েছে। এসব কারণের একদিকে যেমন রয়েছে অর্থনৈতিক বাস্তবতা, অন্যদিকে সামাজিক, মনসতাত্ত্বিক ও রুচিগত মাত্রাও বাদ দেয়া যায় না। অতিরিক্ত জনসংখ্যা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য একধরনের বাস্তবতা, আবার সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব, দুর্নীতি ও আয়-বঞ্চনা অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত। কোনোটিই বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র ও দারিদ্র্যের কারণ নয়। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের পেছনে উভয়ই সক্রিয়, সমন্বিতভাবে ক্রিয়াশীল।

তিন

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন : কয়েকটি দার্শনিক মডেল

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য প্রাকৃতিক কিংবা ভাগ্যজনিত ঘটনা নয়। এটি সমাজ থেকেই সৃষ্ট। ভোগবাদী অর্থনৈতিক নীতি, সামাজিক অবিচার, দুর্নীতি ও অর্থের অসম বন্টনের কারণে উদ্ভূত হয়ে থাকে ক্ষুধাও দারিদ্র্য। প্রশ্ন হলো তাহলে এই সংকট কীভাবে নিরসন করা যায়। ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি দার্শনিকগণ পরামর্শ করেছেন। এসব পরামর্শ অধিকাংশই নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত। দারিদ্র্য বিমোচনের মতো মহৎ উদ্যোগকে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক নীতিদার্শনিকগণ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা নিচের ডায়াগ্রামে দেখানো যেতে পারে:

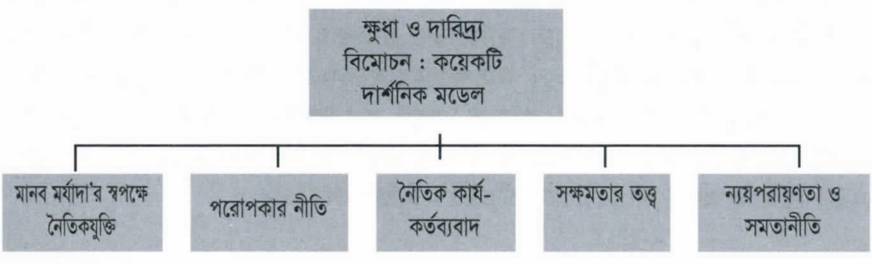

ডায়াগ্রাম ২: ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনে নীতিদার্শনিক মডেলসমূহ

ক. মানব মর্যাদার স্বপক্ষে নৈতিকযুক্তি (moral argument for human dignity), খ. পরহিতসাধনের নীতি (principle of benevolence), গ. নৈতিক কার্যবাদ (moral functionism), ঘ. সক্ষমতার তত্ত্ব (capability theory), ঙ. ন্যায়পরায়ণতা ও সমতানীতি (theory of justice nad equality), চ. সাহায্য প্রদান নীতি (principle of aid)। উপর্যুক্ত নীতিগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো :

ক. মানব মর্যাদার স্বপক্ষে নৈতিকযুক্তি: মানুষের মর্যাদাকে কোনোভাবেই হেয় করা যাবে না। কিন্তু ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মানব মর্যাদার জন্য অপমানকর। ইমানুয়েল কান্ট ও অন্যোরাও নীল মানব মর্যাদাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। তাদের এই বিবেচনা থেকে অনেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে মানব মর্যাদার পরিপন্থি হিসেবে দেখান।

ডায়াগ্রাম ৩ : ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন নৈতিক মডেল-১ (মানব মর্যাদা)

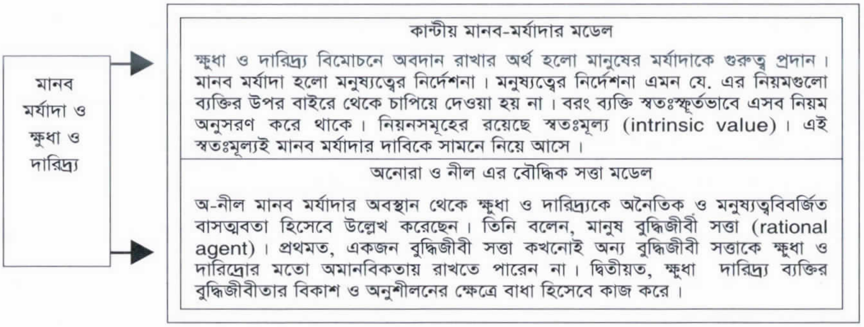

খ. পরহিতসাধনের নীতি: পরহিতসাধনের নীতির প্রচলিত অর্থ হলো গরিব, দুস্থ ও আর্ত মানুষের মঙ্গল ও লাভকে প্রাধান্য দেওয়া। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও রোগ-শোক উপশমের জন্য সামর্থ্যবান মানুষদের যা যা করণীয় সেসবকে গুরত্ব দিবেন দুস্থ ও আর্ত পীড়িত মানুষের জন্য। দরিদ্র মানুষের সু-স্বাস্থ্যের জন্য সঠিক ঔষধ, টিকা কিংবা যথোপযুক্ত প্রতিষেধক আবিষ্কার করাও এই লাভজনক নীতির মধ্যে পড়ে। এ নীতিটি স্বতসিদ্ধ একটি নৈতিক নিয়ম। যে কারোর জন্য অক্ষতিকর নীতি হলো একটি স্থির-কর্তব্য (constant duty)। এ কর্তব্য দ্বারা বোঝায় যে কোনো অবস্থায় অন্য কারো ক্ষতি করা যাবে না। আবার, লাভজনক নীতিটি সীমিত কর্তব্য (limited duty)। যেমন, একজন চিকিৎসক যে কোনো অবস্থায় রুগীর সর্বোচ্চ মঙ্গল প্রত্যাশা করবেন। সুতরাং পরহিতসাধনের নীতির দুটি দিক রয়েছে: একটি হলো কারো ক্ষতি না করা, অন্যটি অপরের মঙ্গল বা উপকার করাকে নিজের মঙ্গল জ্ঞান করা।

---

8 Holtman, Sarah Williams, 2004, "Kantian Justice and Poverty Relief". Kant-Studien, no.95, 86-106.

'Neill, Onora, 1980. "The Moral Perplexities of Famine Relief", in Matters of Life and Death, ed. by Tom Regan, Philadelphia: Temple University Press.

ডায়াগ্রাম ৪ : ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচন নৈতিক মডেল-২ (পরহিতসাধনের নীতি)

পরহিতসাধনের নীতি	
ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকার নীতি	১. কারোর ক্ষতি বা মন্দ করা উচিত নয় (যা নৈতিকভাবে যথোচিত নয়)।
পরহিতসাধনের নীতি	২. প্রত্যেকেরই উচিত ক্ষতি বা মন্দকে প্রতিরোধ করা। ৩. প্রত্যেকের উচিত ক্ষতি বা মন্দকে অপসারণ করা। ৪. প্রত্যেকেরই উচিত ভালো কাজ করা। অথবা ভালো কাজকে উৎসাহিত করা উচিত।

গ. নৈতিক কার্যবাদ: অমর্ত্য কুমার সেন, মার্থা নুসবাম এবং ডেভিড ক্রকার প্রমুখের মাধ্যমে এরিস্টটলীয় ধারার বিকাশ ঘটে। তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তির কার্যকরিতার মধ্য দিয়েই একটি পরিপূর্ণ জীবনের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তির কার্যকরিতা বলতে কখনোই স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া ও পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সম্পৃক্ততাকে বোঝায় না। বরং কার্যকরিতার সঙ্গে যুক্ত হলো বুদ্ধিবৃত্তি, ব্যবহারিক দক্ষতা, সামাজিকীকরণ ও স্বাধীনতা। এজন্য যদি কোনো ব্যক্তি অন্যদের কল্যাণ নিয়ে ভাবেন তাহলে প্রথমেই তাকে ক্ষুধা বিমোচন নিয়ে ভাবতে হবে। দুটি কারণে এ ভাবনা জরুরি:

প্রথমত, শারীরিক কার্যকরিতার (bodily functioning) প্রয়োজনে যথার্থ ও পর্যাপ্ত পুষ্টি জরুরি,

দ্বিতীয়ত, ক্ষুধা নানাভাবে যথার্থ কার্যকারিতাকে ব্যহত করে থাকে। নষ্ট করে দেয় মানুষের সক্ষমতাকে। এরিষ্টটলীয় কার্যকারিমূলকের ইতিবাচক দিক হলো এটি মানব-কল্যাণের একটি পরিপূর্ণ ধারণা দিতে সক্ষম। এ তত্ত্বের আরেকটি দিক হলো উপযোগবাদী এবং কান্টীয় ধারার সীমাবদ্ধতাসমূহ সনাক্ত করতে সক্ষম।

ঘ. স্বত্বাধিকার তত্ত্ব: স্বত্বাধিকার বলতে সেন বুঝিয়েছেন, প্রত্যেকটি সমাজে ব্যক্তির কিছু অধিকার ও সুযোগ থাকে। এসব সুযোগ ও অধিকার কাজে লাগিয়ে সে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। যেমন, কোনো একজন ব্যক্তির ইচ্ছা হলো বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী থেকে একটি পছন্দের পণ্য ক্রয় করে তা উপভোগ করার। এই যে ক্রয় করার সক্ষমতা সে অর্জন করেছে, ইচ্ছামাফিক কোনো পণ্য কিনতে পারছে এটাই হলো স্বত্বাধিকার। অমর্ত্য সেন আরো একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে স্বত্বাধিকারকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। ধরা যাক, কোনো একজন ব্যক্তি উপার্জন করতে পারছে ২০০ ডলার। এখন তার প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো পণ্যগুচ্ছ সেগুলো যদি

9 Dreze, Jean and Sen, Amartya, 1989. Hunger and Public Action (HPA), Oxford: Clarendon Press.

10 Croker, David A. 1997. 'Hunger, Capaility and Development', In Ethics in Practice, ed by Hugh La Follette, London: Blackell Pub., p. 607.

২০০ ডলারের মধ্যে হয় এবং সে যদি তা অনায়াসে কিনতে পারে এই সামর্থ্যই হলো স্বত্বাধিকার। অর্থাৎ ২০০ ডলার কিংবা তার চেয়ে কম দামী পণ্যসামগ্রী তার স্বত্বাধিকারের মধ্যে পড়ে। তাহলে স্বত্বাধিকার নির্ভর করে কয়েকটি শর্তের উপরে :

(১) ব্যক্তির কাজ জোটানোর সামর্থ্যের উপরে,

(২) সেই কাজের পারিশ্রমিকের উপর ও ব্যক্তি যেসব পণ্যসামগ্রী কিনতে চায় তার মূল্যের উপরে।

সুতরাং সবমিলিয়ে এখানে দুটি স্বত্ব রয়েছে, একটি হলো সম্পত্তির উপর ব্যক্তির মালিকানা স্বত্ব এবং অন্যটি হলো বিনিময়ের সুযোগ। এই স্বত্বের উপলব্ধি ব্যক্তিকে কয়েকটি সামর্থ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। পুষ্টি অর্জনের সামর্থ্য ও খাদ্যের সামর্থ্য তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, ব্যক্তি হয়তো স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সেবা, শিক্ষাসহ অন্যান্য সক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে। সুতরাং সক্ষমতা অর্জনের শর্তটি স্বত্বাধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি না করার ফলেই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। এপ্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের উদাহরণ আনেন। এখানে তিনি দেখান, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে স্বত্বাধিকার সমস্যা ঘটেছিল। সেন বিভিন্ন তথ্যসূত্রের আলোকে দেখান, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন ও মজুদ দুর্ভিক্ষ হবার মতো ছিল না। সেন এর তথ্যসূত্র অনুসারে ৭১-৭৪ সময়ে মাথাপিছু খাদ্যের জোগান সবচেয়ে বেশি ছিল ১৯৭৪ সালে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয়েছে ১৯৭৪ সালে। এসময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কৃষকের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে যথাসময়ে তারা ফসল বপন করতে পারেনি। ফলে দিনমজুর কাজ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এই বঞ্চনার ফলে সে অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্যহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মজুদদার ও ফটকাব্যবাসায়ীরা খাদ্য বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মূল্যবৃদ্ধি করে দেয়। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে তারা পণ্যের উপর স্বত্বাধিকার হারিয়ে ফেলে। সৃষ্টি হয় দুর্ভিক্ষ। এজন্য সেন বলেন, একমাত্র সক্ষমতা সৃষ্টি এবং স্বত্বাধিকারই পারে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখতে।

উপর্যুক্ত দুটি মডেলকে এভাবে দেখাতে পারি :

ডায়াগ্রাম ৫ : ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন নৈতিক মডেল-৪ (কার্যবাদ)

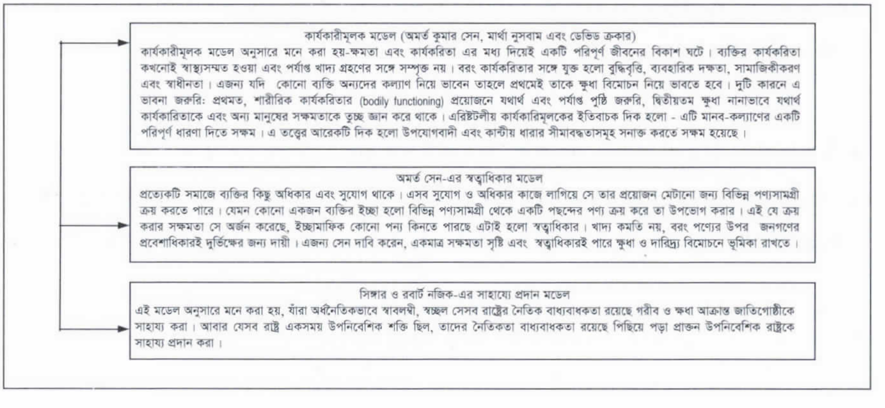

ঙ. ন্যায়পরতার নীতি: এরিস্টটলের "giving to each that which is his due" নীতির উপর ভিত্তি করে ন্যায়পরতার নীতির দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিটি দ্বারা বোঝায় সমাজে যে কোনো দ্রব্য বা পণ্যসামগ্রীর বণ্টনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত বণ্টন নীতি প্রয়োজন। পাশাপাশি ভোক্তার যথার্থ স্বত্বাধিকার (fair entitlement) রয়েছে কি-না তাও বিবেচনার বিষয়। আবার অনেকসময় হয়তো দেখা যেতে পারে কোনো একটি পণ্যসামগ্রীর স্বল্প যোগান থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে হয়তো বন্টনের সমতা বা যথোপযুক্ততার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এরকম বাস্তবতায় যথোপযুক্ততা বা ন্যায় হলো সীমিত সম্পদের যোগান বাড়ানো ও বরাদ্দ দেওয়া। ন্যায়পরতার নীতিটি মূলত কতোগুলো আদর্শ অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়। সেগুলো হলো :

১. প্রত্যেক ব্যক্তির সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা,

২. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য প্রদান করা,

৩. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য অনুসারে পারিশ্রমিক প্রদান,

৪. প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই মাত্রায় গুরুত্ব দিতে হবে যে-মাত্রায় সে অবদান রাখে।

সামাজিক জীবনে, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি ন্যায়পরতা থাকে তাহলে সেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থাকতে পারে না।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন নৈতিক মডেলকে আমরা উপর্যুক্ত ডায়াগ্রামে (মডেল-১, মডেল-২, মডেল-৩ ও মডেল-৪) দেখাতে পারি। চারটি মডেলের মধ্যে প্রথম মডেলটি কান্ট, ও ওনীল-এর নৈতিক নীতিসমূহের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ মডেলটি নীতিদর্শনের সঙ্গে অর্থনীতির সমন্বয় করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কৌশল দেখানো হয়েছে। সবকয়টি মডেলেই ব্যক্তির মর্যাদা, স্বাধীনতা, স্বত্বাধিকার, এবং বৌদ্ধিক সত্তার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা পিটার সিঙ্গারের The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty আলোকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনের মডেল উপস্থাপন করার প্রয়াস নেব। পাশাপাশি উক্ত মডেলের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ সাপেক্ষে নতুন যে মডেল উপস্থাপন করব তা ত্রিমাত্রিক কাঠামো মডেল হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেব।

চার

৪.১ গরীবকে সাহায্য প্রদান প্রচলিত কয়েকটি মতবাদ : সিঙ্গারের খ-ন

সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করা যায়। পিটার সিঙ্গার বলেন, বিশ্বের ক্ষুধার্ত, পীড়িত ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতি সাহায্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা হলো সামাজিক

11 Sen, Amartya, 1981, Famine and Poverty, Oxford : Oxford University Press.

12 Sen, Amartya K., 1977. "Starvation and Exchange Entitlements: A General Approach and its Aplication to the Great Bengal Famines", Cmbridge Journal of Economics, No.1.

সহানুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করারই নামান্তর। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে 'সহযোগিতর নীতি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম বিশ্ব ও তৈলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর কথা ধরা যাক। তৃতীয় বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশ ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত। কিন্তু, ঐসব দেশের নাগরিকগণ যদি তাদের নিজস্ব মানবীয় চাহিদাসমূহ মিটিয়ে সম্পদের যে উদ্বৃত্ত অংশ থাকে তা থেকে কিছু অংশ ক্ষুধাও দারিদ্র্য আক্রান্ত মানুষের জন্য সাহায্য করে, তাহলে দারিদ্র লঘুকরণে অনুন্নত বিশ্ব অনেকদূর অগ্রসর হতে পারবে।

ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনে সহযোগিতা করার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি পিটার সিঙ্গার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। বিশ্বব্যাংকের একটি তথ্যের সাহায্যে সিঙ্গার বলেন, ধনী দেশসমূহ যদি তাদের আয়ের কিঞ্চিৎ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য আক্রান্ত মানুষের জন্য সাহায্য করে তাহলে পৃথিবী থেকে ক্ষুধাও দারিদ্র্য অনায়াসে বিমোচন করা যাবে। কিন্তু সাহায্য প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা তা করছে না, ফলে দারিদ্র্য দেশের জনগোষ্ঠী রোগ-শোক, অভুক্তি, অপুষ্টি এবং মৃত্যুর ন্যায় পরিণামী যন্ত্রণায় আক্রান্ত হচ্ছে। ব্যক্তিকে হত্যা করা আর মৃত্যুবরণে বাধ্য করা এ দুয়ের মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। কর্তব্যবোধের দিক থেকে উভয়টিই অন্যায়। পিটার সিঙ্গার তাঁর The Life You Can Save গ্রন্থের তৃতীয় এ সম্পর্কিত একটি রূপরেখা দিয়েছেন।

তিনি প্রথমেই উল্লেখ করেন, সাহায্য করার বহুমুখী উৎস রয়েছে। চ্যারিটি তন্মধ্যে একটি। কিন্তু সাহায্যের উৎস হিসেবে চ্যারিটি কতোটা কার্যকর। এপ্রশ্নের একটা যুৎসই উত্তর লক্ষ করা যায় পিটার সিঙ্গারের The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty গ্রন্থের "Common Objection to Giving" অধ্যায়ে। অনেক তাত্ত্বিকই চ্যারিটি সংগঠনকে অনুদান দেবার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এরকম আপত্তির বিরুদ্ধে সিঙ্গারের অবস্থান হলো :

"ধরা যাক আমেরিকার অপেক্ষাকৃত ধনী শহরতলী বোস্টনের কোনো একটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ঐচ্ছিক বিষয় পছন্দ করতে বলা হলো। বিষয়সমূহ হলো: সাহিত্য, ন্যায়তত্ত্ব ও স্লেনভিউ হাই (এটি একটি ছদ্মনাম)। তারই অংশ হিসেবে তাদের শিক্ষাকে পিটার সিঙ্গারের ১৯৯৯ সালে The New York Times এ প্রকাশিত দারিদ্র্য বিষয়ক প্রবন্ধটিও কোর্সের অংশ হিসেবে পড়তে দেওয়া হলো। এরকম অবস্থায় তাদেরকে অনুরোধ করা হলো এ প্রবন্ধটির প্রতিক্রিয়া লেখার জন্য। লক্ষ করা গিয়েছে যে, শিক্ষার্থীরা যে প্রতিক্রিয়া করেছিল তা একেবারেই আমেরিকান সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্য থেকে"।

সিঙ্গারের এই বর্ণনার ধরনটি প্রচার কম ভাবে নৈতিক অপেক্ষা কর্তাবাদী দৃষ্টিকোণ দ্বারা আচ্ছন্ন। শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া থেকেই বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। ধরা যাক, 'ক' কোর্সের শিক্ষার্থী ক্যাথরিন লিখেছেন, "পৃথিবীতে কৃষাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ বলে কোনো

সর্বজনীন কোড নেই। আর এটা খুবই ভালো হয় যদি পৃথিবীর সবাইকে তার নিজস্ব বিশ্বাস কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে চলতে দেওয়া হয়।" পিটার সিঙ্গার এরকম পরিপ্রক্ষিতের জবাবে বলেন, আমাদের অনেক বিশ্বাস আছে যেগুলো বেঠিক, আমাদের উচিত ঐসব বেঠিক বিশ্বাস অনুসরণে কাজ বন্ধ করে দেওয়া। তিনি বলছেন, " যেসব লোকজন অমানব-প্রাণীর প্রতি হিংস্র আচরণ করে তা আমাদের বন্ধ করা উচিত। যেভাবে ধর্ষককে ধর্ষণের মতো ন্যাক্কারজনক কাজ বন্ধ করতে বাধ্য করি। সন্ত্রাসীকে থামিয়ে দিই তাদের সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য।" এরকম উদাহরণের প্রেক্ষাপটে সিঙ্গার বলেন, বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে আমরা যদি নৈতিক আপেক্ষাকৃতবাদকে পরিহার করি তাহলেই কেবল তা পরিহার করা সম্ভব।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সাহায্য না করা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় আপত্তি হলো "প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার আছে তার অর্জিত অর্থসমূহ তার খেয়ালখুশি মতো খরচ করার।" এর জবাবে সিঙ্গার বলেন, প্রথমত, গরীব দেশের মেধাবী লোকেরা নিজেদের উন্নয়নে তেমন কোনোই ভূমিকা রাখতে পারছেন না, কারণ তাদের সফলতা দেখানোর মতো তেমন কোনো সুযোগ সুবিধাই নেই। কিংবা, তারা জানে না কোন ক্ষেত্রে কীভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কারণ তাদের সেরকম পর্যাপ্ত পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধাদি নেই। এপ্রসঙ্গে সিঙ্গার নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক হার্বার্ট সিমন প্রদত্ত "সামাজিক পুঁজি তত্ত্বের" বিবেচনাটি উপস্থাপন করেন। এখানে তিনি দেখান, পৃথিবীর গোটা আয়ের ৯০% ভাগই সম্পদশালী সমাজের। কুক্ষিগত অর্থ গুটি কয়েকজনের নিয়ন্ত্রণে। এ অর্থ যদি সামাজিক পুঁজি বৃদ্ধিতে সাহায্য করা হয় তাহলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে খুবই সহায়ক হবে। সামাজিক পুঁজি হলো দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা, দায়িত্বশীল পুলিশ ফোর্স, ন্যায়বিচারক কোর্ট, সুনিয়ন্ত্রিত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নির্ভরযোগ্য পাওয়ার সাপস্নাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। অধিকাংশ দারিদ্র্য দেশের এই সুযোগসমূহ নেই। এসব সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্ভব ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কমিয়ে আনা।

উপর্যুক্ত অধিকারবাদী অবস্থানের সমালোচনায় সিঙ্গার বলেন, কারো অধিকার আছে এর অর্থ নয় তা ঔচিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সিঙ্গার বলতে চাচ্ছেন, আমাদের অর্থের সাহায্যে আমাদের কী পছন্দ করা উচিত তা নির্ধারণ করাই যৌক্তিক। শতকরা উচুঁ হারের কর, কিংবা অন্যকোনো চাপমূলক পন্থায় সাহায্য বাড়ানোর কথা সিঙ্গার বলছেন না। কোনো সরকারেরই দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল নিয়ে তিনি সমালোচনা করছেন না। বরং তিনি বিত্তবানদের প্রভাবিত করতে চাচ্ছেন কীভাবে তারা গরীবদের সহযোগিতা করার জন্য ভূমিকা রাখতে পারেন ।

১৩ উদাহরণটি নেয়া হয়েছে,
Singer, Petter, 1981. Practical Ethics, Cambridge : Cambridge University Press, p.162.
14 Ibid, p. 162
15 Singer, 2009, pp. 24-5.
১৬ সিঙ্গারের এসম্পর্কিত আলোচনার জন্য দেখুন : Singer, 2009, p. 25.
17 Singer, 2009, p. 26.

সাহায্য প্রদান করার বিরুদ্ধে আরেকটি আপত্তি হলো, উচু হারের কর প্রদানের মাধ্যমে আমেরিকানরা প্রচুর অবদান রাখছে তাদের সামাজিক উন্নয়নে। বিত্তবানগণ তাদের উপার্জিত অর্থ থেকে অধিক হারে রাষ্ট্রকে কর দিচ্ছেন। সুতরাং সেই করের সুবিধাদি তারাই ভোগ করবে। প্রশ্ন হলো গরীব মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমেরিকানরা কেন এতো উঁচু হারের কর দিবে। সিঙ্গার এধরনের আপত্তির জবাবে বলেন, অধিকাংশ জনগণ কি ভাবছে তা কতোটা তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা জানা দরকার। কারণ, আমেরিকান সরকারী ব্যায়ের মাত্র ১% এর চেয়ে কম পরিমাণ অর্থ বিদেশী সাহায্যে অনুদান করছে। চারটি জরীপেই দেখা যায় আমেরিকান নাগরিকগণ জানতে চেয়েছে কী পরিমাণ অর্থ বিদেশী সাহায্য হিসেবে যাচ্ছে। আমেরিকান নাগরিকদের উপর পরিচালিত এ গবেষণা থেকে জানা যায় অধিকাংশ আমেরিকান জনগণই বলেন, আমেরিকান জনগণ বেশিমাত্রায় বিদেশী সাহায্য দিচ্ছে, কিন্তু যখনই জিজ্ঞাসা করা হয় আমেরিকানদের কী পরিমাণ সাহায্য দেওয়া উচিত। তাদের অনেকেই বলেন, সরকারী আয়ের ৫% থেকে ১০% সাহায্য দেওয়া উচিত। কিন্তু, অনেকেই সাহায্যের যে পরিমাণের কথা বলেন তা আমেরিকার প্রকৃত সাহায্য প্রদানের চেয়ে পাঁচ থেকে দশগুণ বাড়িয়ে বলা হয়। এমনকী প্রতি ৳১০০ আয়ের মধ্যে ২৫ সেন্টও তারা বিদেশী সাহায্যের জন্য বরাদ্দ রাখছেন না। আবার অনেকে চিন্তা করেন, জনগণকে অর্থ সাহায্য দেওয়া উচিত কেবল খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য। এরকম অভিযোগের জবাবে সিঙ্গার বলেন, আবশ্যই জরুরি কোনো প্রয়োজন ব্যতিরেকে আমাদের সরাসরি অর্থ বা খাদ্য সাহায্য দেওয়া উচিত নয়। এতে করে পরনির্ভরশীলতা বেড়ে যাবে।

অনেক উন্নত বিশ্বেই দেখা যায় স্থানীয় বাজারে খাদ্য ধ্বংস করা হয়, এবং বিক্রি করার জন্য কৃষকরা যেন কম খাদ্য উৎপাদন করে সেজন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। আমাদের উচিত তাদের প্রয়োজনসমূহ ধারণযোগ্য নীতির আলোকে মেটানো। আর সেটি তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায়ই হওয়া উচিত। এজন্য সিঙ্গার মনে করেন, সাহায্য প্রদানের জন্য সঠিক পন্থা বের করা মামুলি বিষয় নয়, কিন্তু এটি সম্পন্ন করা জরুরি।

তিনি আরো যে যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করেন তা অনেকটা ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসরণে। এ যুক্তিতে তিনি উল্লেখ করেন, পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে করে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যের সংকুলান হয়ে উঠবে না। দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত মানুষদের সাহায্য প্রদান দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য ভয়ানক পরিণাম ডেকে নিয়ে আসতে পারে। এধরনের যুক্তির বিরুদ্ধে সিঙ্গার তিনটি পাল্টা যুক্তি দাঁড় করান :

প্রথমত, পৃথিবীর প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য আমরা উৎপাদন করি, যদি আমরা সেসব শস্য অমানব-প্রাণিকে না খাইয়ে সরাসরি মানুষের মধ্যে সরবরাহ করতে সাহায্য করি গ্রহণ করি তাহলে তা মানুষের ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ কমিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট।

দ্বিতীয়ত, লোকজন বেশি করে সন্তান নেয় একারণে যে বৃদ্ধাস্থায় তারা তাকে দেখাশোনা

করবে। কিন্তু, কোনো রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধশালী হতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন জনসংখ্যা কমানো, কম সন্তান গ্রহণ করা। কারণ খুব ক্ষেত্রেই রয়েছে যেখানে সন্তানরা তার পিতামাতার দায়িত্ব নেয়।

তৃতীয়ত, কোনোপ্রকার চাপমূলক পরিমাপ না করেও আমরা জনসংখ্যাকে একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বেধে রাখতে পারি। লক্ষ করা যাক, গরীব রাষ্ট্রসমূহে যেসব মেয়েদের কেনো শিক্ষা-দীক্ষা নেই তাদের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েদের সন্তান-সন্ততি কম। উদাহরণটি আমাদের ইঙ্গিত করছে নারী-শিক্ষাই পারে অধিক জনসংখ্যা রোধ করতে। অনেক ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রকও অধিক জনসংখ্যা রোধে ভূমিকা রাখতে পারে। আরেকটি আপত্তি এসেছে অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ইস্টারলির মাধ্যমে। তিনি The White Man's Burden গ্রন্থে দেখান গরীব রাষ্ট্রসমূহের জন্য পাশ্চাত্য ধনী রাষ্ট্রসমূহের প্রদত্ত সাহায্য অনেকটা অকার্যকরী। গত পঞ্চাশ বছরে পাশ্চাত্য ধনী রাষ্ট্রসমূহ গরীবদের জন্য ব্যয় করেছে ৮২.৩ ট্রিলিয়ন পরিমাণ অর্থ। কিন্তু এখন পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। এমনকী গরীব পরিবারের লোকজন চার ডলার খরচ করতে পারে না মশারী কেনার জন্য। উইলিয়াম ইস্টারলির এরকম সমালোচনার জবাবে সিঙ্গার বলেন, প্রত্যেকটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র যে পরিমাণ সাহায্য দেয় তার অধিকাংশই রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থে প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া সাহায্য করে এই শর্তে যেন গরীব রাষ্ট্রসমূহ তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে। এই শর্ত অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করলেও সাহায্য হিসেবে ঐ অর্থ গরীব মানুষদের জন্য খুব একটা কাজে লাগে না। সুতরাং, পাশ্চাত্য সাহায্যসমুহ যে শর্তে প্রদান করা হয় তা খুব একটা কার্যকরী হয়ে উঠবার কথা নয়।

শেষতক অনেক তাত্ত্বিকরাই ধনী রাষ্ট্রসমূহের সাহায্য নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাঁরা বলেন, সাহায্য গরীবদের অবস্থার উন্নতি না করে বরং ক্ষতিই করে থাকে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই সমস্যাটিকে বলা হয় "ডাচ রোগ" (dutch disease)। এই সমস্যাটি হলো যখন কোনো একটি রাষ্ট্রে বাইরের অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটে, তখন তার সমসাময়িক অর্থ প্রচলিত মূল্যের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। এতে করে রপ্তানি মূল্য বেড়ে যায় এবং স্বদেশী প্রস্তুতকারকদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়। অর্থনীতির এই রোগ কমানোর জন্য বিদেশী সাহায্য পরিহার করাই উত্তম। কোনো রাষ্ট্র যখন বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য তার অবকাঠামোগত উন্নয়নে, কৃষি পদ্ধতি ও প্রযুক্তির উন্নয়নে, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদন সক্ষমতা ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে ব্যয় করে তখনই কেবল "ডাচ অর্থনৈতিক রোগজনিত সমস্যা সমাধানে তা ভূমিকা রাখতে পারে।" সুতরাং সাহায্য প্রদান নিয়ে প্রচলিত এসব মতবাদের বিরুদ্ধে পিটার সিঙ্গারের অবস্থান। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা সিঙ্গারের অবস্থানটি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেব।

পাঁচ

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সিঙ্গার-এর মডেল

উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদে ক্ষুধার্ত ও দরিদ্রদের সাহায্য বিরোধী তত্ত্ব সম্পর্কে সিঙ্গারের সমালোচনাটি ইঙ্গিত করে তিনি বিদেশি সাহায্যের পক্ষ। এই লক্ষে তিনি The Life You Can Save গ্রন্থে দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেছেন :

প্রথমেই তিনি উলেস্নখ করেন, প্রত্যেকের উচিত চরম দারিদ্র্য (extreme poverty) সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। অনেকে যদিও মনে করেন, দারিদ্র্য নির্মুল বা বিমোচন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যদি আমরা নৈতিক আচরণের পরিবর্তন করতে পারি তবেই কেবল সেটি সম্ভব। আমরা প্রত্যেকেই যেন নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞাস করি আমরা কি করছি এবং আমাদের কি করা উচিত। এ প্রশ্নটির সদুত্তরই পারে আমাদেরকে নৈতিক জীবনের দিকে নিয়ে যেতে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নৈতিক জীবন যাপনের জন্য আমাদের গতানুগতিক ধ্যান ধারণার পরিবর্তন খুবই জরুরি। এজন্য প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। নৈতিক জীবনের অধিকারী হবার জন্য প্রয়োজন মানসিক পরিবর্তনের অপরিহার্য শর্তসমূহ অনুসরণ করা। এই শর্তকে তিনি যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা আমরা দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি:

১. প্রথমতই আমাদের মধ্যে মানবিকতা (philanthropy) জাগাতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিঙ্গার স্থানীয় পর্যায়ে কর্মবাদী (local activism) হবার পরামর্শ দেন। প্রত্যেকটি সচেতন মানুষের উচিত স্থানীয় জনগণ সক্রিয়, উদ্যোমী ও কর্মঠ করে তোলা। এই লক্ষে তাদের মধ্যে প্ররোচনা ও প্রচারণা চালানো খুব জরুরি। তৃতীয় পর্যায়ে তিনি রাজনৈতিক সচেতনতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। জনগণের বোধ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক সচেতনতার জন্ম হবে সেটাই তাদেরকে প্রেরণা দিবে ধনী রাষ্ট্র থেকে আসা সাহায্যসমূহ যথার্থভাবে বণ্টন করতে।

২. এই শর্তটি সহযোগিতা করার মনোভাবের সঙ্গে জড়িত। স্বচ্ছল প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত তার অর্জিত আয় থেকে অতিরিক্ত গরীবদের জন্য খরচ করা। এপ্রসঙ্গে তিনি আমেরিকান জনগণের উদাহরণ দিয়ে বলেন, ৯৫% আমেরিকান যদি তাদের আয়ের ৫% গরীব মানুষের জন্য অনুদান প্রদান করে তাহলে সেসব দেশে কোনো দারিদ্রতা থাকার কথা নয়।

---

18 Singer, 2009, pp. 35, 36, 37.

19 Singer, 2009, pp. 121, 122, 123, 124.

20 Easterly, William, 2007. The White Man's Burden. London: Penguin. p. 4; quoted in Singer, 2009, pp. 105, 108.

21 Singer, 2009, p. 112.

প্রশ্ন হলো ধনী রাষ্ট্রসমূহ কেন গরীবদের সাহায্য করবে। এ প্রশ্নের জবাব পাই সিঙ্গারের The Life You Can Save গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে। একটি উদাহরণের সাহায্যে তিনি বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন। ধরা যাক, কোনো একজন ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় সে রাস্তার পাশের পুকুরে একটি শিশুকে ডুবে যেতে দেখল। অথচ আশে পাশে কেউ নেই যে তাকে বাঁচাবে। কিন্তু, পথচারি যদি শিশুটিকে বাঁচাতে চায় তাহলে তার জুতো ভিজে যাবে, কাপড় কর্দমা লাগতে পারে। এমনকি তিনি যে কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছেন সেখানে তার বিলম্ব ঘটতে পারে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির কী করা উচিত।

সিঙ্গারের ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা অনুসারে অবশ্যই আমাদেরও উচিত ঐ ডুবে যাওয়া শিশুটিকে উদ্ধার করা। এখানে দুটি মূল্য সমান্তরালভাবে রয়েছে:

১. একটি মূল্য হলো ডুবে যাওয়া শিশুর জীবন।

২. অন্য মূল্যটি হলো পথচারির জুতা ভিজে যাওয়া, কাপড়ে কাদা-মাটি ভরা এবং তার অফিসে দেরিতে পৌঁছানো ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত দুটি বিকল্পের মধ্যে যে কেউই হয়তো মেনে নিবেন যে ডুবে যাওয়া শিশুটির প্রাণ বাঁচানো বিষয়ে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। যেকোনো মূল্যে এ কাজটি আমাদের করা উচিত। এটির সঙ্গে মানবমূল্যের শর্তটিও জড়িত।

এপ্রসঙ্গের সূত্র ধরে সিঙ্গারও বলেন, যে কেউ আমরা চরমভাবে নিশ্চিত যে, ডুবন্ত শিশুর জীবন রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। যে কোনো মূল্যে আমাদের এ কাজটি করা উচিত। অনেকে হয়তো বলত পারেন দৈনিক হাজার হাজার শিশু মারা যাচ্ছে। অনেক শিশু রয়েছে যারা পুষ্টিহীনতায় মারা যাচ্ছে, অথচ তাদের জন্য আমরা কিছুই করতে পারছি না। তাহলে যেসব শিশু আমাদের থেকে দূরবর্তী কোথাও খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে, তাদেরকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য আমরা কী করতে পারছি। কিংবা তাদেরকে সাহায্য করা কী বেঠিক। যদি তাই হয়, তাহলে গরীব লোকদের কতোটুকু সাহায্য করা উচিত। এরকম দুটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াসই হলো পিটার সিঙ্গার-এর The Life You Can Save এর মূল লক্ষ।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে অন্যান্য উপায় বা কৌশলের পাশাপাশি আমাদের মনস্তত্ত্বও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যেমন, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যদি কোনো সম্মেলনে কঠিন বা দুর্গম কোনো স্থানে যেতে হয় আমরা সেরকম স্থানে যেতেও প্রস্তুত। দারিদ্র্য বিমোচনের মতো যুগান্তর-সৃষ্টিকারী ঘটনার জন্য আমাদের যার যতোটুকু সামর্থ্য রয়েছে সেটুকু সাধ্যমত প্রদান করার মানসিক প্রস্তুতি থাকা জরুরি। সম্প্রতি পৃথিবীর ধনীরাষ্ট্রের কিয়দংশ জনগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এই ইস্যু নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই লক্ষে ওয়ারেন বাফেট ৩১ বিলিয়ন ডলার এবং বিল গেট্স ও মেলিন্ডা গেট্স ২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দান করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পিটার সিঙ্গারও জোরালোভাবে দাবি করেন, উন্নত বিশ্বের কিয়দংশ যদি তাদের জীবনের

চাকচিক্য কিছুটা বর্জন করে গরীবদের জন্য সঞ্চিত রাখে তাহলে অনায়াসে পৃথিবীর বিশাল গরীব জনগোষ্ঠীর জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ নিয়ে আসতে সক্ষম। অধিকসংখ্যক লোক যদি এ ক্ষেত্রে কোনো অবদান না রাখে তাহলে আমাদের পক্ষে সম্ভব না এই লক্ষে উপনীত হওয়া। এরকম বাস্তবতায় আমরা প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাস করতে পারি : "গরীবদের সাহায্য করার জন্য আমাদের কী করা উচিত।" এপ্রসঙ্গে সিঙ্গার দুটি লক্ষ নির্ধারণের কথা বলেন :

এক. যারা চরম দারিদ্র্যসীমায় বাস করে তাদের জন্য কিছু করার বাধ্যবাধকতা একটি সংগ্রামে পরিণত করতে হবে।

দুই. নিজের আয় বা উপার্জন থেকে কিছু অংশ দারিদ্র্যদের সাহায্যে রেখে দেবার মতো মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সিঙ্গারের মডেলটির গুরুত্ব হলো নৈতিকভাবে ধনী মানুষদের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করা। পাশাপাশি মানুষদেরকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা যে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য একটি অমর্যাদাকর ও অমানবীয় বাস্তবতা। এই বাস্তবতা বোঝানোর জন্য তিনি গরীবদের কিছু সাধারণ অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেছেন।

৫.২ গরীবজনদের সাধারণ কিছু অভিজ্ঞতা

কেন গরীব মানুষদের সাহায্য করা উচিত। সিঙ্গার এ প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধানের লক্ষে দারিদ্র্যের একটি সংজ্ঞা অনুসন্ধান করেছেন। এপ্রসঙ্গে পিটার সিঙ্গার বিশ্ব ব্যাংকের সূত্র ধরে দারিদ্র্যের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বহন করে :

১. সারা বছরই যদি খাদ্যের ঘাটতি থাকে, তাহলে ব্যক্তি দ্বিধার মধ্যে পড়ে যায়। সন্তানের ক্ষুধা ও নিজের ক্ষুধা এ দুই বিকল্পের মধ্যে কোনটিকে সে জিইয়ে রাখবে এ নিয়ে তাকে উভয় সংকটে পড়তে হয়।

২. গরীব হবার কারণে তাদের কোনো অর্থনৈতিক মজুদ থাকে না। যদি তাদের পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ে, জটিল কোনো রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে তাদেরকে ধার-দেনা করে জীবন নির্বাহ করতে হয়। অথবা কোনো সংস্থা থেকে ঋণ নিতে হয়। যদি কোনো কারণে পরবর্তী সময়ে ভালো মতো ফসল না ফলে, কিংবা কোনো কাজ না পায় তাহলে তারা এই ঋণ আর পরিশোধ করতে পারে না। এতে করে তাদের অর্থসংকট আরো প্রকট আকার ধারণ করে।

---

22 Singer, 2009. p.3.
23 Singer, 2009. p. xiii-iv.
24 Singer, 2009. pp. 5-6.
25 Singer, 2009. (p. 8).
26 Singer, 2009. p. 6)
27 Singer, 2009. ,p. xv

৩. অর্থনৈতিকভাবে গরীবজনরা সংকটাপন্ন হবার কারণে তাদের সন্তানদের শিক্ষা অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারে না।

৪. বসবাস করতে হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ভঙ্গুর ঘরে, যা প্রায়শই মেরামতের প্রয়োজন হয়। এই মেরামতের জন্যও তার স্বল্প আয় থেকে প্রতিবছর অনেক টাকা খরচ করতে হয়।

৫. এমনকী গরীবজনদের বিশুদ্ধ পানি পানেরও কোনো ব্যবস্থা নেই।

গরীবজনদের দুরবস্থা সম্পর্কে তিনি আমাদের জানান, তারা সকল সময়ই অপুষ্টিতে ভোগে। তাদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত খাদ্যের পুষ্টিগুণ নেই। গরীবদের এ অবস্থা বর্ণনায় তিনি বলছেন,

"শিশুদের মধ্যে পুষ্টিহীনতা প্রচন্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলাফল এমন যে অনেকসময় তাদের মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি হয় যা অনেক ক্ষেত্রে সেরে উঠে না। শারীরিক বৃদ্ধি শ্লম হওয়াসহ তারা দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে, ফলত তারা ন্যূনতম যেটুকু শারীরিক শক্তি থাকার কথা সেটুকুও হারিয়ে ফেলে। এমনকী তারা কায়িক কোনো পরিশ্রম ও কসরতও করতে পারে না।"

এরকম বাস্তবতায় মানুষ হিসেবে তাদের যে মর্যাদাবোধ থাকার কথা সেটুকুও হারিয়ে ফেলে। মাত্রাগত দিক থেকে দারিদ্র্যের নিকৃষ্ট ধরনটি হলো চরম দারিদ্র্য (extreme poverty)। ক্ষমতাহীনতা, সামাজিক ও অর্থনেতিক কোনো নিরাপত্তা না পাবার কারণে গরীবদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে আরো চরম অধোগতি হয়। গরীব মানুষজন আরো গরীব হতে থাকে। এমনকী যেসব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত সুশাসন রয়েছে সেসব রাষ্ট্রেও অনেক গরীব জনগণ জীবনের চরম অবহেলাকে প্রতিবাদহীনভাবে মেনে নেয়। বিশ্বব্যাংকের এক জরীপে অধিকাংশ উত্তরদানকারী এরকমই জানিয়েছেন। আবার এরকমও দেখা গিয়েছে কোনো সরকারী অনুদান বণ্টনের সময় তারা কম পেলে পুলিশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে অভিযোগ করলে তারা মোটেই পাত্তা দেয় না। অনেক গরীব জনগণ যদি ধর্ষিত হয়, কিংবা যৌন-নিপীড়নের শিকার হয়, সেক্ষেত্রে আইনও তাদেরকে প্রতিকার করে না। প্রতিনিয়ত বঞ্চনা ও হীনম্মন্যতা তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সন্তানদের তারা পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদান ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে। তাদের জীবনেও কোনো স্বাচ্ছন্দ নেই। আয়েস করার সুযোগ নেই। এমনকী প্রয়োজন অনুসারে বেঁচে থাকার ন্যূনতম কোনো অবলম্বনও তারা পায় না। এসব কারণে তারা যেমন শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে থাকে, তেমনি মানসিকভাবেও তাঁরা লজ্জা ও ব্যর্থতায় ন্যুব্জ থাকে। বস্তুত হীনদরিদ্র অবস্থা প্রতিনিয়ত গরীবজনদের তাড়িত করে। সর্বদা তাকে ভারাক্রান্ত থাকতে হয় আশাহীনতা দ্বারা। জীবন থেকে নিজেকে আড়াল রাখতে হয়। কঠোর পরিশ্রমেও পরিশেষে তেমন কিছুই অর্জিত হয় না। গরীবদের এই দুরবস্থা প্রসঙ্গে পিটার সিঙ্গার তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধে একই কথা বলেছেন, "যেসকল মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে তাদের চেয়ে আমরা যারা

স্বাভাবিক জীবন যাপন করি তাদের জীবন অসীম হারে উৎকৃষ্ট ।"

তাহলে এ অবস্থা থেকে মুক্ত হবার উপায় কী হতে পারে । পিটার সিঙ্গারের খতিয়ে দেখা ধারণাসমূহ পরবর্তী অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা হলো ।

ছয়

দারিদ্র্য বিমোচনের পক্ষে সিঙ্গার-এর প্রধান যুক্তিসমূহঃ

ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে সিঙ্গারের মৌলিক যুক্তিটি (the basic argument) এখানে উপস্থাপন করা হলো । সিঙ্গার জোরালোভাবে দাবি করেন, বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থাকে অনুদান দিতে আমরা বাধ্য । এই বাধ্যবাধকতার যুক্তিকে তিনি মৌলিক যুক্তি (the basic argument) হিসেবে দাঁড় করান । নিম্নোক্ত কাঠামোয় তিনি যুক্তিটিকে দাঁড় করান :

প্রথম আশ্রয়বাক্য : খাদ্য, বস্ত্র-বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হলো বেঠিক ।

দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য : যা থেকে মন্দ ঘটছে যদি আমাদের সেরকম কোনো ক্ষমতা বা সামর্থ্য থাকে তাহলে তা বিমোচনে এগিয়ে আসা উচিত । প্রয়োজনে ন্যুনতম কোনো ত্যাগ শিকার করে সাহায্য করাও নিকটতম জরুরি (nearly as important) কাজ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত । আর আমরা যদি এভাবে কাজ না করতে পারি, কিংবা তা না করি তাহলে তা বেঠিক ।

তৃতীয় আশ্রয়বাক্য : কোনো সাহায্যকারী সংস্থা গরীবদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে । আর খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসাসেবার অভাবের কারণে সংঘটিত মৃত্যুকে রোধ করতে পারি জরুরি কোনো ত্যাগ না করেই ।

সিদ্ধান্ত : অতএব, তুমি যদি কোনো সাহায্যকারী সংস্থাকে দান না করো তাহলে সেটি অনুচিত হবে ।

আমরা যদি আমাদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিত্য প্রয়োজনীয় অভাবসমূহ মেটাতে পারি তবেই কেবল দাবি করতে পারব যে, আমাদের খরচসমূহ খুশিমতো করেছি । আবার, কোনো একজন আগন্তুক যিনি আমাদের সমাজের সদস্য নয়, তাকে সাহায্য করি তাহলে একটি ভালো কাজ করেছি বলে দাবি করতে পারব । কিন্তু, আগন্তুককে সাহায্য করতে গিয়ে আমরা যেন নিজস্ব কমিউনিটির সদস্যদের কথা ভুলে না যাই । এপ্রসঙ্গে সিঙ্গারও বলছেন,

"আমরা যদি আমাদের উদ্বৃত্ত আয় কোনো গানের কনসার্টে, কিংবা কোনো ফ্যাশন প্রদর্শনীর জন্য, কিংবা খুব উন্নতমানের সুস্বাদু খাবারের জন্য, অথবা দামি মদের জন্য, অথবা বন্ধের দিনটি নতুন কোনো স্থানে ভ্রমণ করে খরচ করি তাহলে তা নিশ্চয়ই একটি মন্দ কাজ হবে । কিন্তু, এর ব্যতিক্রম কোনো কাজ করি তাহলে অনেকেই হয়তো হতবাক হতে পারেন, অভিনব মনে হতে পারে । আমাদের এই অভিনব কাজের মানসিকতা সৃষ্টি

করতে হবে।

অভিনব কাজটি হলো মানুষের জন্য কিছু করা। সাহায্য করা। ক্ষুধা ও দারিদ্রের কষ্ট থেকে মানুষকে মুক্ত করা। সিঙ্গার দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রথাগত বিধি ও ধর্মীয় জীবনাচরণেও গরীবকে সাহায্য করার নির্দেশনা রয়েছে। তার যুক্তির কেন্দ্রীয় বক্তব্যও একইরকম। তিনি বলেন, বিশেষ করে খ্রীষ্টীয়, ইহুদি ও ইসলামীয় শিক্ষার সিদ্ধান্ত অনুসারে সাহায্য কোনো ঐচ্ছিক কাজ নয়, বরং এটি হলো বাধ্যতামূলক কাজ। সিঙ্গার তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে দেখিয়েছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীগণ গরীবকে দান করার যিশুর শিক্ষাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন। টমাস একুইনাসের উদ্ধৃতি দিয়ে সিঙ্গার বলেন, আমাদের যা প্রয়োজন তার থেকে বেশি যেন আমরা অপচয় না করি, বরং আমাদের খরচের উদ্বৃত্ত অংশ যেন গরীবদের যেন ব্যয় করি। চার্চের ডাক্তার এমব্রোসের দৃষ্টান্ত ও Decretum Gratiani-এর বরাদ দিয়ে তিনি গরীবকে সাহায্য করার কথাই দাবি করেন।

সিঙ্গার জিউসদের নীতি-নৈতিকতা ও আইন সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় গ্রন্থ Talmud এর উল্লেখ করে বলেন, উক্ত ধর্মগ্রন্থে নির্দেশ রয়েছে জিউস জনগণ অবশ্যই তাদের উপার্জিত আয়ের ১০% গরীবদের দান করবেন। এবিষয়টিকে হিব্রু ভাষায় tzedakah বলা হয়। যার আক্ষরিক অর্থ হলো charity বা দান । আভিধানিক অর্থে এটি আবার ন্যায়ও। একইভাবে মুসলমানগণও, যারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, তাদের অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যাকাত হিসেবে গরীবদের মধ্যে বন্টন করবে এরকম বিধান রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় স্বচ্ছল ব্যক্তিদের সংরক্ষিত সম্পদের (ক্যাশ কিংবা তরল সম্পদের) ২.৫% যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে।

দান করার প্রসঙ্গটিকে আরো প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য তিনি কনফুসীয় দার্শনিক মেনিকাসের উদাহরণ দেখান। একবার কিং হু'র কোনো এক রাজসভায় মেনিকাস জোরালোভাবে বলছেন, যদি তুমি রাস্তায় কোনো ব্যক্তিকে অভুক্ত বা দুর্ভিক্ষ অবস্থায় মরতে দেখ, তাহলে তোমার উচিত সেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে তোমার রক্ষিত শস্য থেকে দান করা। তুমি যখন দেখছ কেউ না খেয়ে মারা যাচ্ছে তখন তার মুখে খাবার তোলে দাও। কিন্তু, আমরা যখন কাউকে না খেয়ে মরতে দেখি তখন বলে থাকি "এ মৃত্যু আমার নয়, এটি অন্য কেউ ধারণ করছে। এখন তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় কাউকে তুমি ছুড়িকাবিদ্ধ করছ এবং কাউকে মেরে ফেলছ, যদি জানতে চাওয়া হয় এ দু'য়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি-না তাহলে কী জবাব হবে। হয়তো তখন ঐ ব্যক্তি বলবে। ব্যক্তিটিকে আমি খুন করিনি, তাকে খুন করেছে ঐ অস্ত্রটি"। কিন্তু এই দু'য়ের মধ্যে যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই তা আমরা বোঝার চেষ্টা করি না।

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, কেন আমরা সাহায্য করব অথবা করব না। এ পর্যায়ের আলোচনায় সিঙ্গার জানাতে চেয়েছেন : যদি উন্নত বিশ্বের জনগণের অল্প ও

সীমিত সাহায্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের শিশুদের বাঁচাতে পারে, তাহলে কেন তারা সেটা করবে না। সিঙ্গার এর পেছনে ছয়টি কারণ উল্লেখ করেছেন :

ক. সনাক্তকৃত শিকার (the identifiable victim): অনেকে হয়তো দাবি করতে পারেন, আমরা যখন কারো জীবন বাঁচাতে চাইব অবশ্য তাকে চিনতে হবে, আমাদের কাছে পরিচিত হতে হবে। অনেক সময় কোনো গোষ্ঠী অপেক্ষা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি যাকে চিনি তার জন্য আমরা কিছু করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকি। কিংবা যাকে সাহায্য করব তার অবস্থা, দুরবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হই কেবল তাদেরকেই সাহায্য করতে চাই বলে। এ বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে সিঙ্গার পল স্লোভিকের গবেষণার সাহায্য নেন। স্লোভিক দুটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির (psychological systems) মধ্যে পার্থক্য দেখান :

১. আবেগপূর্ণ পদ্ধতি (affective system) ও

২. সুচিন্তিত পদ্ধতি (deliberative system)।

প্রথমত, পদ্ধতিটি ব্যক্তির আবেগর সঙ্গে সম্পৃক্ত,

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ব্যক্তির যুক্তি বা প্রজ্ঞার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ব্যক্তিসত্তা প্রায় সময়ই আবেগপূর্ণ পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে থাকে। এই বাস্তবতায় ব্যক্তি যুক্তি বা প্রজ্ঞা অপেক্ষা আবেগের দিকে বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে।

খ. সংকীর্ণতা (narrowness): মনস্তাত্ত্বিক কারণে সকল সময়ই তার নিজের আত্মীয়, বন্ধুজন, এবং স্বদেশের জনগণের কথা চিন্তা করে থাকেন। সামর্থ্যবান মানুষদের থেকে দূরবর্তী কোনো স্থানের জনগণের কথা তারা সাধারণত ভাবেন না। এই সংকীর্ণতার কারণে অনেকসময় দূরবর্তী রাষ্ট্রের গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য, পুষ্টিহীন শিশুদের জন্য সাহায্য করা হয়ে উঠে না।

গ. নিরর্থকতা (futility): সাধারণত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যারা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে আমরা সাহায্য করব। কিন্তু, অনেকের কাছে প্রশ্ন জাগতে পারে এটা কী অনর্থক হচ্ছে। অথবা কেন আমরা নিজ জনগোষ্ঠীর বাইরে অন্যদের সহযোগিতা করব। এসব প্রশ্ন ব্যক্তিকে সহায়তা করা অথবা সাহায্য করা থেকে বিরত রাখে।

ঘ. দায়িত্বের অসংশ্লেষ বোধ (The diffusion of responsibility): অনেকসময় দেখা যায় আমাদের সমাজের অনেক ব্যক্তি যারা যথেষ্ট স্বচ্ছল অথচ দারিদ্র্য বিমোচনে কিংবা ক্ষুধায়

---

28 Singer, , 2009. pp. 15-6.
29 Singer, 2009. p. 18.
30 Singer, 2009. pp. 19-20.
31 Singer, 2009, p. 21.
32 Mengzi [Mencius] Liang Hui Wang I, http://chinese.dsturgeon.net/text.pl|node=16028&if=en. Quoted in Singer, p. 22, accessed on 10 April.
33 Singer, 2009, pp. 46-50.

আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সাহায্য করছেন না তখন অন্যরাও সাহায্য থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। অর্থাৎ অন্যদের দায়িত্ববোধের সঙ্গে ব্যক্তি তার দায়িত্ববোধকে মিলিয়ে দেখেন। এই বোধটি অনেকটা সহানুভূতিমূলক। দেখা গেল কোনো সমাজের জনগণের অধিকাংশই পরোপকারী। তন্মধ্যে গুটিকতেক রয়েছেন যারা সাহায্য বা অনুদান সম্পর্কে খুব একটা ধারণা রাখেন না। কিন্তু তারাও দান করেন একারণে যে ঐ সমাজের অধিকাংশ জনগণই দান করতে অভ্যস্ত। কিন্তু সমাজের অনেকে যেহেতু দান করে না, সেহেতু দায়িত্বের এই অসংশ্লেষাত্মক বোধের সঙ্গে বাকীরা একাত্ম হয়ে দান করা থেকে বিরত থাকেন।

চ. ন্যায্যতার মনোভাবের অভাব (lack of sense of fairness): ন্যায্যতার মনোভাব ব্যক্তির মধ্যে একদিকে যেমন সমতার নীতি অনুসারে কাজ করতে বলে, অন্যদিকে জাত, বর্ণ, গোত্র ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে উঠে ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করে। কিন্তু, ব্যক্তিগণ প্রায়ই জাতীয়তাবাদী চেতনার বলয়ে, কিংবা সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদী প্রভাবে থেকে সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তারা মনে করেন, নিজ জাতিগোষ্ঠীর কথা না ভেবে, দুরবর্তী অথবা ভিন্ন জাতির জন্য অর্থ বরাদ্দ কিংবা সহযোগিতা করা অযৌক্তিক।

ছ. অর্থ বা মানি (money): প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই অর্থের প্রতি সদয় মনোভাব রয়েছে। একারণেই কেউই চায় না অন্যদের দান করে তার অর্থ নিঃশেষ হয়ে যাক। তারা মনে করেন, অর্থের সমৃদ্ধি ব্যক্তিকে যথেষ্ট স্বাবলম্বী করে তোলে। এ মানসিকতার কারণে অনেকেই সাহায্য করে না।

কেন আমরা অধিক সাহায্য করব না। এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, উপর্যুক্ত ছয়টি কারণে কেউ হয়তো দাবি করতে পারেন এসব মনস্তাত্ত্বিক কারণে কাউকে দান বা সাহায্য করা আমাদের স্বভাবগত নয়। মানব চরিত্রে কেন এরকম আচরণের দিকে ঝুঁকতে পছন্দ করে তা হয়তো একসময় মানুষের কাছে বোধগম্য হবে। তাই বলে উপর্যুক্ত যুক্তিসমূহের সাহায্য নিয়ে কেউ বলতে পারবে না তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে সাহায্য করবে না। অসংখ্য দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে দেখানো যাবে যে, মানুষ বৌদ্ধিকভাবে অনুদান করার জন্য প্রভাবিত হতে পারে। The New York Times এর জন্য লিখিত এক নিবন্ধে সিঙ্গার উল্লেখ করেন, অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা UNICEF কিংবা আমেরিকানভিত্তিক অক্সফাম সংস্থায় সাহায্য পাঠান, অনুদান দিয়ে থাকেন। এসব সংস্থা পিটার সিঙ্গারকে জানিয়েছেন, নিবন্ধটি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে ফোনে সাহায্য করার পরিমাণ বেড়ে ৮৬০০,০০০ দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ হলো নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বচ্ছল মানুষকে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। অনেক অনুদানকারীগণ এখনও সে সাহায্য অব্যাহত রেখেছেন। প্রশ্ন হলো এসব অনুদানের মূল্যায়ন করব কীভাবে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে অনুদান মূল্যায়ন-এর কৌশলসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সাত

৭.১ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে অনুদান : কয়েকটি সীমাবদ্ধতা

সিঙ্গার মনে করেন অনুদান বা চ্যারিটি প্রদানের বড় সংকট হলো এর প্রভাবের খতিয়ানটি অনেকসময় বোঝা যায় না। ধরা যাক, কোনো একটি সাহায্যদানকারী সংস্থা বৈশ্বিক দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষে কাজ করছে। উক্ত সংস্থাটি তাদের ব্যয় হ্রাস করানোর জন্য স্টাফ সংখ্যা কমিয়ে আনে। তবে যেসব স্টাফদের সংখ্যা তারা কমিয়েছেন তাদের সাহায্য বা অনুদান প্রদানের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রয়েছে। ফলে সংস্থাটি তাদের প্রশাসনিক কাজে লোকবল কমিয়ে এনে যে অর্থ উদ্বৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছে, সেই উদ্বৃত্ত অর্থের সাহায্যে আরো বেশিসংখ্যক গরীব মানুষের মধ্যে সাহায্য বিতরণ করা সম্ভব। কিন্তু, বিশেষজ্ঞ স্টাফ কমানোর ফলে সংস্থাটি তাদের অনুদান পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় ভুল ত্রুটি করতে পারে। এ ত্রুটির ফলে গোটা সাহায্য দান প্রক্রিয়াটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কারণ কোনো একটি প্রজেক্টের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অবশ্যই উচু দক্ষতাসম্পন্ন স্টাফ বা বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন রয়েছে। গোটা প্রজেক্টটি সচল রাখার জন্য বিশেষজ্ঞ স্টাফদের পেছনে অর্থ ব্যয় হতে পারে। এই ব্যয়টিও গোটা প্রজেক্টের সফলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং, চ্যারিটি মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। এ মূল্যায়ন গোটা কর্মতৎপরতাকে আরো সফলভাবে করতে সাহায্য করবে। চ্যারিটির কর্মসফলতা বা মূল্যায়নের জন্য সিঙ্গার পুনঃপুন নিয়ন্ত্রণ ট্রায়াল (random controlled trials) ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। তবে অনেক চ্যারিটি সংস্থা হয়তো মূল্যায়নের এই পরীক্ষাটি নাও করতে পারে। তারা মনে করতে পারেন মূল্যায়নের এই ধারাটির ফলে সংস্থার ব্যয় বেড়ে যেতে পারে।

সিঙ্গার বিশ্বাস করেন চ্যারিটির কার্যক্রমসমূহ যথার্থভাবে বা সফলভাবে হচ্ছে কি-না তা মূল্যায়নের জন্য ঐ ট্রায়াল পদ্ধতিটি ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন,

"অনেক মানুষকে নিয়ে কোনো সাহায্য করার প্রজেক্ট গ্রহণ করার চেয়ে স্বল্পসংখ্যক মানুষকে নিয়ে ফলপ্রসূ প্রজেক্ট অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ প্রজেক্ট পরিচালনার জন্য, প্রজেক্টের মূল্যায়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, তা প্রজেক্টের মূল লক্ষে বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। একটি সফল প্রজেক্টের জন্য অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যায়কে অবশ্যই বিবেচনা রাখতে হবে। সুতরাং, অনেকের দারিদ্র্য বিমোচনের দায়িত্ব অসফলভাবে পালনের চেয়ে অল্প কয়েকজনকে সফলভাবে দারিদ্র্যের আওতার বাইরে আনা খুবই জরুরি।"

অনেক সাহায্য প্রদানকারী সংস্থা লাভও বয়ে আনতে পারে। কিন্তু, সংখ্যার বিবেচনায় তা খুব একটা উল্লেখযোগ্য নাও হতে পারে। তবে প্রত্যেকটি সাহায্যের লক্ষ হওয়া উচিত সামর্থ্য নির্মাণ (capacity building)। এর আওতায় গুরুত্ব পাবে দুটি বিষয়:

প্রথমত. গরীবকে সাহায্য করতে হবে এই লক্ষে, তারা যেন আত্মস্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

দ্বিতীয়ত, নারীদের নানা ইস্যুতে সহায়তা দিতে হবে এই লক্ষে তারা যেন তাদের আইনগত অধিকারসমূহ আদায়ে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রসঙ্গের সূত্র ধরে সিঙ্গার মিলেনিয়াম ভিলেজ প্রজেক্টের (MVP) কথা বলেন। এই প্রজেক্টটি প্রস্তাবক ছিলেন অর্থনীতিবিদ জেফরি সাক্সস (Jeffry Sachs)। উক্ত প্রজেক্ট আমাদের শিখিয়েছে একই সঙ্গে কীভাবে বহুবিধ ধারায় সাহায্য করা যায়। মিলেনিয়াম ভিলেজ প্রজেক্টে পরামর্শসমূহ হলো। গরীব জনগোষ্ঠীকে বিশুদ্ধ পানীয় পানের ব্যবস্থা করা, শিশুদের জন্য ভিটামিন ও বিশুদ্ধ পানীয় পানের সুব্যবস্থা করা, শিশুদের জন্য বিভিন্ন টীকা দান কর্মসূচি গ্রহণ করা, বসবাসের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা, শিশুদের ভেতরকার পরজীবী নাশ করার জন্য কৃমিনাশকের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই প্রজেক্টে আরো সুপারিশ করা হয় । প্রতিবছর প্রতি গরীব ব্যক্তিকে ন্যুনতম ৳১১০.০০ সাহায্য প্রদান করা উচিত। তন্মধ্যে গ্রাম থেকে আসা গরীবজনদের জন্য ৳১০.০০ রাখতে হবে। যদি দেখা যায়। এই প্রক্রিয়াটি যথার্থভাবে কাজে লাগছে না, তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যে সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। সাহায্য যে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগছে তা বোঝার উপায় কি। সিঙ্গার বলছেন, তা বোঝার উপায় হলো জীবনের গুণগত মানের প্রদত্ত ইনডেক্সসমূহ লক্ষ করা। সাহায্য পাবার ফলে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্মীয় হতে হবেঃ

১. তাদের ফসল উৎপাদনে উন্নয়ন করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে,

২. নারীরা তাদের সামাজিক কাজকর্মে সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারার স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে,

৩. আগের চেয়ে বালিকা শিশুদের বিদ্যালয়ে যাবার সংখ্যা ও অনুপাত বৃদ্ধি পেতে হবে,

৪.শিশুদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সেবনের মাধ্যমে ডায়েরিয়াজনিত রোগ থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে,

৫. সংক্রামক ব্যাধিসমূহ, যেমন, যক্ষা, কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগসমূহকে টীকা প্রতিষেধকের আওতায় এনে অপ্রত্যাশিত শিশু মৃত্যু রোধ করার সফলতা অর্জন করতে হবে।

---

34 Singer, 2009, pp. 50-2.
35 Singer, 2009, pp. 53-4.
36 Singer, 2009, pp. 56-9.
37 Singer, 2009, pp. 59-61.
38 Singer, 2009, p. 83|
39 Singer, 2009, p. 94.
40 Singer, 2009, p. 94.

সাহায্য যদি উপর্যুক্ত শর্তসমূহ অর্জন করতে সক্ষম হয় তবেই বোঝা যাবে যে, দারিদ্র্য বিমোচনে সাহায্য বা অনুদান কাজে লাগছে। তিনি আশা করছেন আগামী ২০১০-২০১২ সনের (উল্লেখ্য যে তিনি গ্রন্থ লিখেছিলেন ২০০৯ সালে) মধ্যে এই প্রজেক্টটি ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে বলে আশা করছেন। মিলেনিয়াম ভিলেজ প্রজেক্ট -এর মুল লক্ষ্যসমূহ দেখা যাক :

ডায়াগ্রাম ৬: মিলেনিয়াম ভিলেজ এর

লক্ষ্য-১: চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচন করতে হবে।
লক্ষ্য-২: সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষা অর্জন করতে হবে।
লক্ষ্য-৩: লিঙ্গ সমতার উন্নয়ন করতে হবে এবং নারীদের ক্ষমতায়ন ঘটাতে হবে।
লক্ষ্য-৪: শিশু মৃত্যুর হার কমাতে হবে।
লক্ষ্য-৫: মাতুস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করতে হবে।
লক্ষ্য-৬: এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া সহ অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে হবে।
লক্ষ্য-৭: পরিবেশগত ধারণযোগ্য উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।
লক্ষ্য-৮: উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক-অংশীদারিত্ব আরো বাড়াতে হবে।

প্রশ্ন হতে পারে এই প্রজেক্টের আওতায় যেসব লক্ষসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে তা কতোটা অর্জিত হয়েছে। কিংবা এই লক্ষ্য অর্জনের দিকে কতোটা অগ্রসর হতে পেরেছি। এসব সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মিলেনিয়াম প্রজেক্ট গত জুন ২০১২ সালে তাদের ওয়েব্‌সাইটে জানায় : অনেক রাষ্ট্রই বিশ্বায়ন থেকে ফল পাচ্ছে। পাশাপাশি তারা দাবি করছেন, তাদের দেয় নির্ধারিত সময়সীমা ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষসমূহ অর্জনে সফল হবেন। বিশ্বব্যাংকের হিসেব অনুসারে, ১৯৮১ থেকে ২০০১ সালে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করা জনসংখ্যা কমে আসছে। তাদের হিসেব অনুসারে সেটা ১.৫ বিলিয়ন থেকে ১.১ বিলিয়নে নেমে এসেছে। অনেক উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জনসংখ্যার অনুপাত অনুসারে চরম দারিদ্র্য (extreme poverty) ৪০ শতাংশ থেকে নেমে ২১ শতাংশে এসেছে।

পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক অংশেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে, একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানিকতায় ব্যাপক অসমতা রয়েছে। অনেক রাষ্ট্রই মিলেনিয়াম ভিলেজ প্রজেক্টের অধিকাংশ লক্ষই বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। আবার অনেক রাষ্ট্র এমনকী একই রাষ্ট্রের ভেতরের বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ে ন্যুনতম লক্ষসমূহ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। সাব-সাহারান আফ্রিকায় চরম দারিদ্র্য এতোটা প্রকট যে, সেখানে মা ও শিশু মৃত্যুর হার খুবই উচুঁ। এশিয়ার অনেক রাষ্ট্র যদিও দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে, তথাপি শতমিলিয়ন জনগোষ্ঠী এখনও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। আবার লাটিন আমেরিকা, মধ্য

এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপে মিলেনিয়াম লক্ষসমূহ খুবই মন্তর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথাও এই গতি খুবই নিম্নমানের।

পিটার সিঙ্গার কোনোপ্রকার আনুষ্ঠানিক সমীক্ষা না করেই সাহায্যের বেশকিছু বাস্তবভিত্তিক উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত উদাহরণের প্রথমটি হলো : হস্তচালিত পাম্প মেশিনের সফল চালনায় অভ্যস্ত হওয়া। হস্তচালিত পাম্প- মেশিন চালনায় নারী ও পুরুষের দক্ষতা অর্জনের ফলে তারা দৈনিক তিন থেকে চার ঘন্টা সময় রক্ষা করতে পারছেন। অল্প আয়েসে খাবার পানি সংগ্রহ করতে পারছেন। এতে করে কন্যা-সন্তানেরা কাজ করেও বিদ্যালয়ে যেতে পারছে। দ্বিতীয়ত, সাহায্যের অর্থে প্রচুর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবার ফলে কোনোপ্রকার আপত্তি ব্যতীতই কন্যা-সন্তানেরা ছেলে-সন্তানদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যেতে পারছে। তৃতীয় উদাহরণে সিঙ্গার বলেন, এই সাহায্য আওতায় অনেক অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। এই হলো বৈদেশিক সাহায্যের সফলতার কয়েকটি নমুনা।

তবে সিঙ্গার এটাও উল্লেখ করেন যে, মিলেনিয়াম প্রজেক্ট অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। যেমন দক্ষি এশিয়ার কোনো রাষ্ট্র তাদের বিভিন্ন রাজ্য বা জেলায় সাহায্য সফলভাবে কাজ করলেও অনেক প্রত্যন্ত এলাকা, দারিদ্র্য ঘনত্ব এলাকায় মিলেনিয়াম প্রজেক্টের লক্ষসমূহ বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ এখনও লক্ষ করা যায়নি। বিশেষ করে ভারতের সেভেন সিস্টার খ্যাত রাজ্যসমূহ এখনও এসব লক্ষ্য অর্জিত হবার প্রচেষ্টায় ঢুকেনি। বাংলাদেশের খড়া আক্রান্ত জেলাসমূহ, হাওড় ও প্রান্তিক এলাকায় বিদেশী সাহায্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি।

ক্ষুধা ও দারিদ্রের আরেকটি কারণ হলো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা বা অন্ধত্ব। অথচ অন্ধত্ব দূর করার জন্য এখনও কোনো সক্রিয় বা ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গরীব রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়নি। অন্ধ নাগরিকগণ সফলভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। গরীব দেশে অসামর্থ্যবান জনগণদের সমর্থন দেবার মতো ভালো কোনো ব্যবস্থাও নেই। ফলে তারা কোনো কাজ সুচারুভাবে করতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন সাহায্যের অর্থের দ্বারা তাদের সফল চিকিৎসা করার পদক্ষেপ নেওয়া।

বেশকিছু ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় । অন্ধ ব্যক্তিগণ দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তাদের জীবনমান বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়ে উঠছে। অন্যান্য সক্ষম জনগোষ্ঠীর মতো তারাও কর্মঠ হয়ে উঠছে। সাহায্যের মধ্যে আরেকটি হলো ক্ষুদ্রঋণ। ধনী রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত সাহায্য থেকে তারা যে ক্ষুদ্রঋণ দিচ্ছে, তা দ্বারা অধিকাংশ গরীব মানুষই ছোট ছোট ব্যবসা দাঁড় করাতে সক্ষম হচ্ছে। অনেকে আবার সফল ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে পারছে। আবার অনেকে যারা অপেক্ষাকৃত কম সফল তারাও মোটামুটি খেতে, পড়তে ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে

41 Singer, 2009, pp. 119-20.

42 Singer, 2009, p. 120.

৪৩ এই আলোচনার জন্য দেখুন Millennium Project, <http://www.unmillenniumproject.org/goals/index.htm>)

পারছে। যেমন, যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার পরিবার গরু কিংবা ছাগল বিক্রি করে তাকে ডাক্তার দেখাতে পারছে, ঔষধ কিনতে পারছে। এভাবে সাহায্যের আওতায় পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প বিদ্যমান থাকার ফলে ঐসব জনগোষ্ঠীর জীবনের সবথেকে মূল্যবান জিনিসপত্রাদি বিক্রি করতে হয় না। এমনকী তাদেরকে চরম দারিদ্রের মধ্যেও ডুবে থাকতে হয় না।

৭.২ সাহায্য প্রদানের সংকট ও সিঙ্গারের আরো কয়েকটি সমাধান

প্রশ্ন হলো কেন আমরা সাহায্য করব। সিঙ্গার এপ্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে নৈতিক বাধ্যবাধকতার প্রসঙ্গ এনেছেন। কিন্তু, একজন ব্যক্তি কেন এই বাধ্যবাধকতায় তার নিজেকে আবদ্ধ করবেন। এরকম সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গার মূলত দুটি সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়েছেন:

প্রথমটি হলো আমরা কীভাবে উদ্ভূত সমস্যার অংশ হতে পারি।

দ্বিতীয়টি হলো আমরা কতোটুকু সাহায্য দিতে বাধ্য থাকব।

পরবর্তী দুটি অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কিত পিটার সিঙ্গার-এর বিশ্লেষণ আলোকপাত করা হবে।

ক. আমরা কী করতে পারি। সমস্যা সমাধানের অংশ হতে পারি।

গরীব দেশের মানুষের জীবন রক্ষার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। সিঙ্গার একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন। যেমন, ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগবাহিত মশার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মশারি ব্যবহার করতে হয়। যেমন, মশারি তৈরী করতে হয়তো ৳১০.০০ লাগছে। যারা মশারি ব্যবহার করছে তাদের অধিকাংশই ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে। সুতরাং, কেউ যদি ভাবেন সে তার জীবনকে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করবেন তাহলে তাকে অবশ্যই ১০ ডলার খরচ করতে হবে। যদিও জীবন রক্ষার জন্য ৳১০.০০ খরচ করে অনেকে হয়তো ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হতেও পারেন। তারপরও তিনি জীবন রক্ষার জন্য এই অর্থটি খরচ করতে পারেন। অর্থনীতিবিদ জেফরি সেক্সসের কার্যকারিতার প্রাক্কলন (estimate of the effectiveness) অনুসরণ করে সিঙ্গার হিসেব-নিকেশ করে দেখিয়েছেন, ৳১০.০০ খরচ করার ফলে সে জীবন রক্ষার জন্য নীট লাভ পাচ্ছে ৳২০০.০০। কারণ যদি সে মশারি ব্যবহার না করে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে রোগ সারাতে তার খরচ করতে হবে ২০০ ডলার। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য সিঙ্গার আরো একটি উদাহরণের সাহায্য নেন। একজন ব্যক্তি ১০ ডলার খরচ করে, আরো ১৯০ ডলার সংরক্ষু করতে পারছে। ৳১০.০০ অবদান রেখে সে উনিশজন ব্যক্তির জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করতে পারছে। এই খরচ করার পরেও কেউ নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে তার জীবন রক্ষা হচ্ছে। কিন্তু, এদের মধ্যে কোনো একজন যদি মশারী কেনা বাবদ ৳১০.০০ দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে ঐ

ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

খ. আমরা কতোটুকু সাহায্য দিতে বাধ্য থাকব।

উপর্যুক্ত আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে সিঙ্গার আরেকটি প্রশ্ন দাঁড় করান। সাহায্যের কী কোনো বিকল্প থাকতে পারে। সিঙ্গার বলছেন, একজন সামর্থ্যবান ব্যক্তি হয়তো চিন্তা করেছেন, তিনি যদি সাহায্য না করেন অন্য কোনো ব্যক্তি সাহায্য করবেই। কিংবা কোনো ধনী রাষ্ট্র হয়তো ভাবল তারা যদি সাহায্য না করে, অন্য ধনী রাষ্ট্র হয়তো তা করবে। এতে করে দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত কেউই সাহায্যে এগিয়ে আসলো না। সাহায্য প্রদানে যদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে তাহলে এ সমস্যাটির একটি সমাধান দাঁড় করানো সহজ হবে। ধরা যাক, কোনো একজন ধনী ব্যক্তি সাহায্যের টাকা দিতে ব্যর্থ হলেন, এটি ইঙ্গিত করে না যে, তার পরিবর্তে অন্য কেউ সাহায্যের অর্থ দিয়ে দিবে। এখন প্রশ্ন হলো যদি গরীবদেরকে সাহায্য করতে হয়, তাহলে একজন ব্যক্তির সাহায্য হিসেবে কতো টাকা দেওয়া উচিত। সিঙ্গার তাঁর The Life You Can Save গ্রন্থের Asking Too Much অধ্যায়ে এ প্রশ্নের একটি বিবেচনা দাঁড় করিয়েছেন।

একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন। ধরা যাক, তুমি একটি অগভীর পুকুরের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে তুমি দেখলে দশটি শিশু সাতার কাটতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছে এবং তাদেরকে উদ্ধার করা খুব জরুরি। চারপাশ তাকিয়ে দেখা গেল শিশুদের সঙ্গে পিতামাতা বা তাদের পরিচর্যাকারী কেউ নেই। এর মধ্যে আরো নয়জন প্রাপ্তবয়ষ্ক লোক এসে পুকুরে উপস্থিত এবং তারাও লক্ষ করল শিশুরা ডুবে যাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ শিশু পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তুমি শিশুদের বাঁচানোর জন্য পানিতে নামলে, তাদেরকে হাতের নাগালে নিয়ে আসলে। এক্ষেত্রে হয়তো তুমি প্রত্যাশা করতে পার যে, নয়জন প্রাপ্তবয়ষ্ক মানুষের মধ্যে সকলেই তার মতো পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখবে। এতে করে সকলের সাহায্য পেয়ে সকল শিশুরই জীবন রক্ষা পাবে। তন্মধ্যে লক্ষ করা গেল মাত্র চারজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুদের পুনরুদ্ধারে কাজ করছে, বাকী পাঁচজন পুকুরের পাড়ে পায়চারি করছে। কিন্তু, আরো পাঁচটি শিশু প্রায় ডুবে যাচ্ছে যাদেরকে উদ্ধার করা খুবই জরুরি। এখন আমরা যদি ন্যায্য অংশীদার তত্ত্ব (theory of fair-share) অনুসারে বিষয়টি বিবেচনা করি তাহলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের করণীয় কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করব এই প্রতিশ্রুতি থাকা উচিত। অর্থাৎ উল্লিখিত ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্যদের মতো শিশুদের জীবন রক্ষায় পুকুরে নামব। এখন প্রত্যেকেই যদি তার নিজ নিজ কাজটি সম্পন্ন করে তাহলে শিশুরা বেঁচে যাবে।

উপর্যুক্ত ঘটনায় আপাতত মনে হতে পারে পুকুরের কাছে থাকা দশজন ব্যক্তি দশটি শিশুকে পুকুরের জলে ডোবা থেকে সাহায্য করলো। এতে করে প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায্য

45 Singer, 2009, p. 92.

অংশীদারিত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলা যায়। অর্থাৎ তোমার ন্যায্য অংশীদারিত্ব হলো একটি শিশুকে রক্ষা করা। এ দায়িত্বটি পালন করার মধ্য দিয়ে তোমার এর অধিক কিছুই করার বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু, তুমি ও বাকী চারজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পাঁচটি শিশুকে উদ্ধার করেই কি দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। যেখানে আরো পাঁচটি শিশু প্রায় ডুবে যাচ্ছে। সিঙ্গার মনে করেন, তা করার প্রয়োজন নেই। বরং উক্ত পাঁচজন ব্যক্তিরই উচিত তাদেরকে উদ্ধার করার কাজে নিয়োজিত হওয়া। কারণ ন্যায্য অংশীদারিত্বের কথা চিন্তা করে তাদের উচিত হবে না পাঁচটি শিশুকে মরতে দেওয়া। উপর্যুক্ত দৃষ্টান্ত থেকে বলা যায়। প্রত্যেকটি স্বচ্ছল ব্যক্তিরই ন্যায্যতার অংশীদারিত্বের কারণে উচিত গরীবদের জীবন বাঁচানো। তবে অন্য কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ যদি একাজটি না করেন তাহলে তার উচিত হবে না সাহায্য বা অনুদান বন্ধ করে দেওয়া।

সিঙ্গারের প্রশ্ন হলো আমরা কতোটুকু দিতে বাধ্য থাকিব। এপ্রসঙ্গে তিনি সমকালীন তিনজন দার্শনিক রিচার্ড মিলার, গ্যারেট কালিস্লটি ও ব্রাড হুকার প্রমুখের তত্ত্ব পর্যালোচনা করেন। প্রথমেই তিনি রিচার্ড মিলারের যুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, মিলার চিন্তা করেছেন, "গরীবদের সাহায্য করার ব্যাপারে আমাদের একটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে হবে, সেটি হলো আমরা যদি কেউ বেশি সাহায্য করি তাহলে আমাদের জীবনের মূল্য ও মান গুরুত্বপূর্ণভাবে নিচে নেমে আসবে, অধোপতিত হবে। আমরা কেউই যেন এই শর্তটির বাইরে না যাই।" গ্যারেট কালিস্লটির তত্ত্ব প্রসঙ্গে সিঙ্গার বলেন,

তিনি চরমভাবে বিশ্বাস করে সাহায্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের অবদান রাখা উচিত। যেমন অন্তর্নিহিতভাবে জীবন-প্ররোচনাকারী জিনিস (intrinsically life-enhancing goods): যেমন বন্ধুত্ব, কারো সংগীত বিষয়ক জ্ঞান বিকাশের জন্য সাহায্য করা, এমনকী নিজ সমাজের কারো জীবনকে উচ্ছ্বসিত করার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা উচিত"।

পরিশেষে সিঙ্গার হুকারের দার্শনিক অবস্থান সম্পর্কে বলেন,

"হুকার যুক্তি দেন যে, আমাদের সেই রীতিতে কাজ করা উচিত যাতে করে আমরা

---

46 Singer, 2009, pp. 144-5.

৪৭ এই তত্ত্ব অনুসারে আমরা যখন কোনো কাজে অংশগ্রহণ করার বাধ্যবাধকতায় থাকি তখন অবশ্যই সেখঅনে ন্যায্যতার স্বাক্ষও রাখব।

48 Miller, Richard, 2004, ÒBeneficence, Duty and DistanceÓ, Philosphy and Public Affairs, pp.357-43.

49 Cullity, Garret, 2004. The Moral Demand of Affluence, Oxford: Oxford University Press.

50 Hooker, Brad, 2000. Ideal Code, Real World: A Rule Consequentialist Theory of Morality, Oxford. UK : Clarendon Press.

51 Cf. Singer, 2009. pp. 146-7.

52 Cf. Singer, 2009. p. 147.

53 Cf. Singer, 2009. p. 147.

সর্বোচ্চ উন্নয়ন সাধন করতে পারি। হুকার আরো বলেন, আমরা নৈতিকভাবে বাধ্য গরীবদের জরুরি প্রয়োজনসমূহ মেটানোয় ভূমিকা রাখতে। যদি আমাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয় তাও সাহায্য করার বাধ্যবাধকতায় থাকা উচিত"।

তবে সিঙ্গার স্বীকার করেন, উল্লিখিত তিনজন দার্শনিকের তাত্ত্বিক অবস্থান ন্যায্যতার অংশীদারিত্বের চেয়ে নিকৃষ্ট। তিনটি তত্ত্বই অসংগতিপূর্ণ ও ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রসঙ্গের সূত্রধরে সিঙ্গার বলেন, আমাদের সমাজের অনেক মানুষই রয়েছে যারা ভালো জামা-কাপড় পরিধান করে, ভালো খাবার গ্রহণ করে এবং ভালো স্টেরিও সিস্টেমে গান শুনে আনন্দ পান। যদি সকলকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা সকলকিছুর ঊর্ধ্বে সুখকে প্রাধান্য দিতে পারি। কিন্তু, তারপরও আমরা বলব রিচার্ড মিলার, গ্যারেট কাল্লিটি এবং ব্রাড হুকারের যুক্তির যথেষ্ট দার্শনিক গুরুত্ব রয়েছে। তাঁরা তিনজনই মনে করেছেন, আমাদের নিজেদের অর্থ নিজেদের মতো করে খরচ করার স্বত্বাধিকার কেবল আমাদেরই (যারা বিত্তবান) রয়েছে।

সিঙ্গার দাবি করেন, অবশ্যই ব্যক্তির নিজের অর্থ নিজের মতো খরচ করার অধিকার রাখে। কিন্তু, এই খরচের পরিবর্তে আমরা যদি উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে কারো দুঃখ ঘোচাতে পারি, মানুষের জীবন বাঁচাতে পারি, কিংবা কাউকে বড় কোনো যন্ত্রণা ও ক্লিশকায় অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারি, সেক্ষেত্রে নিজের অর্থ খরচ করার চেয়ে কাউকে দান করা অনেক উত্তম। অনেক চরম অবস্থা আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। কিন্তু, কেউ যদি মনে করেন একটি উন্নত গুণগতমানসম্পন্ন স্টেরিও যন্ত্র আমাদের জীবনের জন্য সুখকর হবে, জীবন উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী হবে তাহলে আমরা হয়তো সেটাই করব, এক্ষেত্রে হয়তো কে মরল বা কার জীবন সংরক্ষিত হলো সে বিবেচনা গৌণ হয়ে দাঁড়াবে। এরকম মনোভাব নিয়ে জীবন যাপন করা কী নৈতিক। কিংবা এরকম জীবন যাপনের প্রয়াস কী "মানবজীবনের সমান মূল্য" এ নীতির সঙ্গে তামাসা করার সমতূল্য নয়। পিটার সিঙ্গার এরকম প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন The Life You Can Save গ্রন্থের The Realistic অধ্যায়ে। উক্ত অধ্যায়ে তিনি বলেন, ধনী ব্যক্তিদের অবশ্যই গরীবদের জন্য সাহায্য করার বাধ্যবাধকতায় থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো এ বাধ্যবাধকতা কীভাবে বণ্টন করা হবে।

৭.৩ সাহায্যের আনুপাতিক বণ্টন

ধনী কিংবা স্বচ্ছল ব্যক্তিরা কীভাবে গরীবদের জন্য সাহায্য বণ্টন করবেন। এরকম সমস্যায় সিঙ্গার যে সমাধান দিয়েছেন তা সংক্ষেপে উলেস্নখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, প্রত্যেকের উচিত "যারা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল, কিংবা যারা খুবই ধনী তাদের সকলের উচিত বাৎসরিক আয় থেকে ৫% অনুদান করা। এরকম বাস্তবতা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, যতো বেশি আয় করবে, ততো বেশি তুমি দান করতে পারবে। এটি শুধু ডলারের অর্থে নয়, বরং তোমার আয়ের শতকরা হিসেবে। যদি কেউ

$৫০০০০০ আয় করে, তাহলে সেখান থেকে যদি ৫% অনুদান করে তাহলে সেটা ঐ ব্যক্তির জন্য তেমন কষ্টদায়ক কিছু হবে না। কেননা বাকী অর্থ দিয়ে ঐ ব্যক্তি অনেক ভালো দিন যাপন করতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি $৫০,০০০ আয় করে, আর সেখান থেকে অনুদান বা সাহায্য হিসেবে $২,৫০০ দিয়ে দিতে হয়, তাহলে এটা হয়তো তার জন্য কষ্টদায়ক হবে। সুতরাং, এক্ষেত্রে সিঙ্গারের পরামর্শ হলো অপেক্ষাকৃত গরীব ও হতদরিদ্র কিংবা কম-আয়ের রাষ্টসমূহের জনগণকে ধনী রাষ্ট্র তাদের মুল আয়ের ৫% অনুদান হিসেবে দেয় তাহলে অনায়াসে গরীব মানুষ দারিদ্র্য মোকাবেলা করতে পারবে। এতে করে কারো উপরই তেমন কোনো চাপ সৃষ্টি হবে না।

কীভাবে গরীব জনগণকে ধনীরা সাহায্য করবে পিটার সিঙ্গার তার একটা গাণিতিক সমাধানও দিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ভিন্নরকম অনুদানের শতকরা হিসেবের প্রস্তাব করেছেন। যেমন, যাদের আয় $১০৫,০০১ থেকে $১৪৮,০০০ পর্যন্ত তারা অবশ্যই তাদের আয়ের ৫% অনুদান করবে। কিন্তু, যাদের আয় $১৪৮,০০১ থেকে $৩৮৩,০০০ পর্যন্ত তারা প্রথম $১৪৮,০০০ এর ৫% অনুদান দিবেন, এবং বাকী অর্থের ১০% অনুদান দিবেন। আবার যাদের আয় $৩৮৩,০০১ থেকে $৬০০,০০০ পর্যন্ত অবশ্যই আয়ের প্রথম $১৪৮,০০১ এর জন্য ৫%, পরবর্তী $২৩৫,০০০ এর জন্য ১০% এবং বাকী অর্থ থেকে ১৫% অনুদান দিতে হবে। কিন্তু, যাদের আয় $১০.৭ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে তারা অবশ্যই আয়ের $১৪৮,০০১ এর জন্য ৫%, পরবর্তী $২৩৫,০০০ এর জন্য ১০%, এবং $২১৭,০০০ এর জন্য ১৫%, অবশিষ্ট $১.৩ মিলিয়নের জন্য ২০%, $৮.৮ মিলিয়নের জন্য ২৫%, এবং অবশিষ্ট অর্থের জন্য ৩৩.৩৩% অর্থ অনুদান করবে। সিঙ্গার খুব জোরালোভাবে দাবি করেন, যদি জনগণ এই হারে অনুদান দেয় তাহলে প্রতি বছরে বিলিয়ন বিলিয়ন গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য $৪৭১ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

৭.৪ মিলেনিয়াম প্রজেক্ট প্রসঙ্গে সিঙ্গার. অর্থনীতিবিদ স্যাক্সসের প্রস্তাবনা অনুসারে মিলেনিয়াম প্রজেক্টের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সংগৃহীত এই অর্থ থেকে সবেমাত্র $১৮৯ ব্যয় করতে হবে। আরো উদ্বৃত্ত থেকে যাবে $২৮২ বিলিয়ন। এই অর্থ সারা পৃথিবীর গরীবদের জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য কাঠামোগত কিছু করা সম্ভব হবে। সিঙ্গার মনে করেন, অন্য রাষ্ট্রের ধনী ব্যক্তিদের গরীব রাষ্ট্রের গরীব জনগণের বোঝা মাথায় নিলেই কেবল সারা পৃথিবীর দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে। উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের কেবল এক তৃতীয়াংশ অর্থ আসতে পারে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এ প্রেক্ষাপটে সিঙ্গার পরামর্শ দেন যে, বিশ্ব পর্যায়ে ধনী ব্যক্তিরা $১.৫ ট্রিলিয়ন অর্থ প্রতিবছর উন্নয়ন খাতে সাহায্য করতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যেতে পারে ইউনেস্কো প্রদত্ত

54 Cf. Singer, 2009. p. 147.
55 Singer, 2009. pp. 148.
56 Singer, 2009. pp. 152, 162, 164, 165.
57 Singer, 2009. p. 167.

সাহায্য রীতি, কিংবা কোনো রাষ্ট্রের সাহায্য প্রোগ্রাম কার্যকর নাও হতে পারে। এররম বাস্তবতায় আমাদের কী করণীয় আছে। এ অবস্থা উত্তরণের উপায় কী। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সিঙ্গার সাতটি শর্তের প্রস্তাব করেন যা দ্বারা দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ বিমোচন করা যায়। তাঁর প্রস্তাবিত সাতটি শর্ত দেখা যাক :

১. এসব মানদ-সমূহ মেনে চলার অঙ্গীকার করতে হবে।

২. আমাদের কী করণীয় সেই লক্ষে www.The Life You Can Save.com ওয়েবসাইটটিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। প্রয়োজনে নিজেরাও এ বিষয়ে গবেষণা করতে পারি যার উপর ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব কোনধরনের সংগঠন বা সংস্থাসমূহকে সাহায্য করব কিংবা করব না।

৩. বিগত আয়কর রিটার্ণ মোতাবেক প্রতিবছর আমাদেরকে কতো সাহায্য করতে হবে সেই হিসেবটি দাঁড় করাতে হবে। কিংবা সিদ্ধান্ত নিতে হবে কীভাবে আমরা সেই অনুদানটি প্রদান করব সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন রয়েছে। সেটি কী মাসিক হবে, নাকি ত্রৈমাসিক, কিংবা অর্ধবার্ষিক অথবা বার্ষিক। যেটি আমাদের জন্য উত্তম হয় সেই সিদ্ধান্তটিই আমরা নিতে পারি। সেই অনুসারে কাজ করতে পারি।

৪. অন্য যারা সামর্থ্যবান রয়েছেন তাদেরকে আমরাও বিষয়টি অবহিত করতে পারি। সাহায্য বা অনুদান করার এ কর্মপরিকল্পনাটি তাদের সঙ্গে বিনিময় করতে পারি। তা ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে হতে পারে, কিংবা লিখিতভাবে, ইমেইলের সাহায্যে, ব্লগে অথবা অন্য কোনো অনলাইনের মাধ্যমে সেটি করা যেতে পারে। আমাদের সকলসময় বেশকিছু বিষয় পরিহার করতে হবে। যেমন, আমি যেটি ভাবছি সেটিই সঠিক এরকম ভাবনা পরিহার করতে হবে। আমাদের ভাবনাই একমাত্র যথার্থ তা ভাবা ঠিক নয় একারণে যে আমরা সবাইতা আর সাধু-সন্ত নই। কেবল আত্মসচেতনতাই আমাদেরকে সমস্যা সমাধানের অংশে পরিণত করতে পারে।

৫. আমরা যদি কোনো কর্পোরেশন অথবা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানকে আমরা প্রভাবিত করতে পারি তারা যেন বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থাকে অনুদান প্রদান করে। এমনকী আমরাও আয়ের ১% অনুদান হিসেবে রাখতে পারি যা কোনো চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা হবে। পৃথিবীর গরীব জনগণের জন্য তা নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে।

৬. ধনী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানাতে পারেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন এই লক্ষে যেন বিদেশী সাহায্য গরীবদের জন্য ব্যয় করা হয়।

৭. এসব দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারব কারা চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করে। এমনকী আমরা এটাও প্রচার করতে পারি যে, মানবজাতির মুক্তি অবশ্যই নীতি-

নৈতিকতার প্রভাবে হতে পারে। এভাবেই আমরা সমাধানের অংশ হয়ে উঠতে পারি।

আট

সিঙ্গারে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন মডেলঃ কয়েকটি সমালোচনা

সিঙ্গার উল্লেখ করেন, যিশু আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যখন গরীবকে সাহায্য করি তা যেন অন্য কেউ শুনতে না পায়। সাহায্য এতো গোপনে করতে হবে যেন তোমার ডান হাত যা করছে বাম হাত যেন তা জানতে না পারে। এটির পুরষ্কার পাওয়া যাবে পরকালে, ইহকালে নয়। কারণ কোনো ব্যক্তি যদি মানুষ দ্বারা খ্যাতি বা সম্মান পাবার জন্য দান-দাক্ষিণ্য করে নিজের মান-মর্যাদা বাড়াতে চায় তাহলে তারা কখনো প্রকৃত অর্থে বিনয়ী বা দানকারী নয়। অনেক সময় ব্যক্তিগণ যখন লোক দেখানোর জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ অনুদান বা সাহায্য দান করে তা মূলত নিজেদেরকে মানবতাবাদী কিংবা তারা যে ধনী এবিষয়টি অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, কিংবা সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য করে থাকে। কিন্তু, এসব কী দান বা সাহায্যের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। দান বা সাহায্য সেটি ব্যক্তি যে পর্যায় থেকে কিংবা যে মনোভাব থেকে করুক না কেন এটা কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। দান দানই। সেটা হোক আত্মপ্রচারের জন্য, কিংবা ধর্মীয় অনুভূতি থেকে।

পিটার সিঙ্গার দারিদ্র্যকে সাহায্য করার জন্য যে নৈতিক ও নীতিগত প্রস্তাব করেছেন তা কী যুক্তিযুক্ত কয়েকটি দিক থেকে আমরা উপর্যুক্ত প্রশ্নটিকে বিবেচনা করতে পারি। নানা যুক্তি দেখিয়ে সিঙ্গারের যুক্তিটিকে খন্ডন করা যেতে পারে। প্রথমেই আমরা তাঁর যুক্তিটির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে পারি পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় বিভিন্ন সংগঠন কাজ করছে।ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল তন্মধ্যে একটি। এই সংস্থাটির কাজ হলো গোটা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের সুপ্রশাসন নীতির মাত্রা অনুসারে তালিকা প্রণয়ন করা। প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সুশাসনের দিক থেকে কোন রাষ্ট্রটির অবস্থান কী সেটি নির্ধারণ করাই এর কাজ। তন্মধ্যে দুর্নীতি, সুশাসন ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের দিক থেকে অধোগতির রাষ্ট্রসমূহ থাকে তালিকার শীর্ষে। দুর্নীতির তালিকায় শীর্ষে থাকা রাষ্ট্রসমূহের সাহায্য সংস্থাসমূহকে যদি ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে অনুদান দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায় তার যথার্থ প্রয়োগ অপেক্ষা অপপ্রয়োগ বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে ধরা যাক, বিভিন্ন পর্যায় থেকে অভিযোগ উঠছে বিদেশী সাহায্যসমূহ যথার্থভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এরকম বাস্তবতায় সাহায্য বা অনুদান বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ কতোটা সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অন্যদিকে বণ্টনের ক্ষেত্রেও অবিচার দুর্নীর্তিতে শীর্ষে অবস্থানকারী রাষ্ট্রসমূহের আরেকটি সমস্যা। এরকম বিবেচনায় সাহায্যকারী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান কার্যত একটি ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হবে।

---

54 Singer, 2009, pp. 168-9.

55 Singer, 2009, pp. 168-9.

পিটার সিঙ্গার তাঁর যুক্তিতে দাবি করছেন অনুদান করার জন্য যে কোনো আত্মত্যাগকে অপেক্ষাকৃত নিকটতম জরুরি (nearly as important) হিসেবে মূল্যায়ন করেছে। কিন্তু, এ পরিভাষাটি দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন তা অনেকটা দ্ব্যর্থক। যদিও তিনি ভেবেছেন, যে জনগোষ্ঠী সৎ তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন, ন্যায়বিচার করবেন এটাই স্বাভাবিক। সিঙ্গার একটি ক্ষেত্রে খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, "যুক্তিটি বিতর্কিত হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি নিজের কাজে দায়িত্বশীল হই, ন্যায় হই, তাহলে আমাদের জীবন যাপন থেকে সবকিছুই নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিতত হয়ে যাবে।" সিঙ্গারের এ যুক্তির যথেষ্ট ফলপ্রসু আবেদন রয়েছে। কারণ তাঁর যুক্তিটির মূলকথা হলো আমরা যেন অতিরিক্ত খরচ না করি, এমনকিছু যেন না কিনি যা আমাদের প্রয়োজন নেই। উদ্বৃত্ত খরচ (surplus spending) এবং যার প্রকৃত প্রয়োজন নেই সেরকম বিলাসী দ্রব্য ক্রয়ের বাহুল্য বর্জন করাই আমাদের লক্ষ হওয়া উচিত।

সিঙ্গারের উপর্যুক্ত যুক্তি থেকে আমরা একটি বিষয় অনুমান করতে পারি, এটি সম্ভব কতোগুলো শর্তের মধ্যে :

১.অপরের ক্ষতি করা যাবে না,

২. জনগণকে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে,

৩. কারো সঙ্গে প্রতারণা করা যাবে না,

৪. কোনো অবস্থা সম্পর্কে কাউকে মিথ্যা তথ্য দেওয়া যাবে না,

৫. বৃদ্ধ পিতামাতা ও শিশু-সন্তানাদির প্রতি সহযোগিতার মনোভাব অব্যাহত রাখতে হবে,

৬. নিকটস্থ গোষ্ঠী বা সমাজের যেসব সদস্য অপেক্ষাকৃত অভাবী তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। মানবতা ও মঙ্গলের লক্ষ্য কাজ করতে হবে।

যদি কেউ "মানুষ দ্বারা সম্মানিত হবে" এই নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, কিংবা সাহায্য করা একটি বদান্যতার বিষয় তা দেখানোর জন্য সাহায্য করেন, তাহলে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ হবে। প্রকৃত অর্থে হয়তো সাহায্যকারীর মনোভাবে সেরকম বদান্যতা নেই। এজন্য বলা হয় আত্মপ্রচার কিংবা সামাজিক মানমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করার প্রবণতায় কিছু মন্দ দিক রয়েছে। যেমন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক চর্চায় ভোটবাণিজ্যের সঙ্গে এরকম সাহায্য সহযোগিতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বুর্জোয়া ঘরানার রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনী এলাকায় নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করে থাকে। এই সাহায্যের পেছনে প্রত্যাশা থাকে গরীব জনগণ তাকে ভোট প্রদান করবে কিংবা রাজনৈতিকভাবে সহযোগিতা করবে। নামমাত্র সহযোগিতা গরীব জনগোষ্ঠীর স্থায়ী দারিদ্র্য দূর করতে ভূমিকা রাখে না। কিন্তু, এতে করে গণতান্ত্রিক পরিবেশের ভয়ঙ্কর ক্ষতিও এসে যুক্ত হচ্ছে। যেমন, প্রাপ্ত সাহায্যের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভোট পাবার প্রত্যাশা যুক্ত হয়। এই প্রত্যাশা সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে ভোটপ্রদানের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাপ সৃষ্টি

করে থাকে। ফলে গ্রহীতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দান বা সহযোগিতা করার সামর্থ্যও নির্বাচনী গণতন্ত্রে পরোক্ষ ভাবে একটি শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। একারণে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা যোগ্য, সৎ ও প্রতিশ্রুতিবান নাগরিকগণ নির্বাচনী গণতন্ত্রে সফল হতে পারছেন না। আর ধনী কিংবা ব্যবসায়ী শ্রেণী এ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পাবার ফলে রাজনীতিতে প্রকৃত রাজনীতিবিদ অপেক্ষা ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। ফলে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা ব্যবসায়িক সুবিধা পাবার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করছে। এজন্য সাহায্য করার রীতি তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য একটি ভয়ানক প্রতিবন্ধকতা হয়েও দাঁড়িয়েছে।

সাহায্য করার নীতির বিরুদ্ধে আমরা আরো কয়েকটি সমালোচনা দাঁড় করাতে পারি। আপাতত মনে হচ্ছে সিঙ্গার যিশুর বাণীকে গুরুত্ব দিয়ে সাহায্যকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চেয়েছেন। যেমন যিশু বলছেন, ''তোমার আলো অন্যের জন্য জ্বলতে দাও। এই লক্ষে তুমি তা করো যেন তোমার মহৎ কর্ম যেন স্বর্গের পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়।'' আবার ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি বা সামাজিক মানমর্যাদা অর্জনের জন্যও অনেকে সাহায্য করে থাকেন। তবে উভয়ের মধ্যে স্পষ্টত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যে সিঙ্গার যে প্রস্তাব করেছেন তাতে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিংবা, দান করার মানসিকতা ও সামাজিক মর্যাদা লাভ উভয়ই একাকার হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাহায্য করার বিষয়টি ঈশ্বরের নিমিত্তে, মানুষকে সম্মানিত করার লক্ষ্য নয়। এখান থেকে আমরা দ্বিতীয় যে সমালোচনাটি পাই তা লক্ষ করা যাক: নিশ্চয়ই আমরা দু'ধরনের কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। ব্যক্তির কাজের মধ্যে তার ভালোত্ব নির্ধারণ করতে পারি। আবার ঐ কাজের স্বনিহিত দিক থেকেও কাজের নৈতিক অবস্থা (moral status) নিরূপণ করতে পারি। ব্যক্তির চরিত্রের মধ্যে থাকা ভালোত্ব আর কোনো একটি কাজের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভালোত্ব এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝা যাক। একজন ব্যক্তি যিনি ''সাহায্য করার মতো ভালো কাজ'' করছেন নিজের প্রভাব ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য, অথচ ঐ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভালো নয়। আবার কেউ সাহায্য করছেন এ কাজের মধ্য দিয়ে সে কোনো ফল বা বিনিময় খোঁজবার চেষ্টা করছেন না, বরং সাহায্য করাকে নৈতিক মনে করে করছেন। নিঃসন্দেহে এধরনের সাহায্য স্বনিহিত অর্থে ভালো কাজে পরিণত হতে বাধ্য। কিন্তু প্রথমজনের সাহায্য সেরকম অর্থে স্বনিহিত মূল্য নেই। সুতরাং সাহায্যেও পরিপ্রেক্ষিতের কারণে দু'রকম অর্থ দিচ্ছে।

সিঙ্গার যে নৈতিক মডেলের প্রস্তাব করছেন তার আরো কিছু সীমাবদ্ধতা আমরা

---

56 Singer, 2009, p. 17.

57 Matthew 5:16, NRSV.

উল্লেখ করতে পারি। যেমন, তিনি গরীব ও ক্ষুধার্তকে সাহায্য করার বিষয়টি যতোটা জোর দিয়ে বলছেন, সেই গরীব ও ক্ষুধার্ত মানুষকে স্বাবলম্বী হবার জন্য কোনো পরামর্শ তিনি সেভাবে করছেন না। এ ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেন-এর সক্ষমতা তত্ত্বটি আমরা উল্লেখ করতে পারি। তিনি নানাভাবে অনুসন্ধান করেছেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বড় কারণ খাদ্য ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধাদির উপর জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের অসামর্থ্য। তিনি বলেছেন, "স্বত্ত্বাধিকারের ব্যর্থতা" (failure of entitlement) ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণ। এই ব্যর্থতা সৃষ্টি হয় দু'ভাবে :

প্রথমত, জনগোষ্ঠীর মধ্যে সক্ষমতার (capability) অভাবে,

দ্বিতীয়ত, সামাজিক অবিচারের কারণে।

উপর্যুক্ত দুই ত্রাসকে যদি চিহ্নিত করা যায় তবেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতা আনা সম্ভব। কিন্তু, সিঙ্গারের নৈতিক মডেল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের পেছনে লুকানো এই কারণকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার দায়ে তার সাহায্য ও নৈতিক সমৃদ্ধি মতবাদ ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।

সিঙ্গার যে নৈতিক মডেলের কথা বলেছেন, তা আরো কিছু প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। যেমন তৃতীয় বিশ্বের অনেক সামর্থ্যবান ব্যক্তি রয়েছেন যাদের অর্থনৈতিক সার্মথ্যের পেছনে রয়েছে জনগণের প্রতি অবিচার ও বঞ্চনার মতো অনৈতিক কর্মকান্ড। যেমন বাংলাদেশের ধনিক শ্রেণিদের তালিকা করলে দেখা যাবে করফাঁকি, শিল্পঋণের নামে ব্যাংকের অর্থ লুটপাটের ঘটনা রয়েছে। ধনী হবার পেছনে কারণ হিসেবে রয়েছে পোষাক শিল্পসহ বেশকিছু শিল্পে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে, অথবা অন্যকোনো অনিয়মের মাধ্যমে। অথচ নিয়মতান্ত্রিক অর্থবাজার বজায় রাখলে মানুষের জীবন যাপনের উৎস সমূহে নিয়ন্ত্রণ থাকতো। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য প্রকট আকার ধারণ করত না। আবার স্বাবলম্বী কিংবা বিত্তবানদের সাহায্য নিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কতোটা দূর করা সম্ভাব। অনৈতিক ও অবিচারের মধ্য দিয়ে যারা ধনী হয় তাদেরকে যদি আমরা নৈতিক দায়বদ্ধতা শেখাতে যাই তা হবে হাস্যকর। দায়বদ্ধতার কারণে তারা গরীবদের সাহায্য করবে এরকম ভাবনা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিয়ে ফ্যান্টাসি করার সামিল।

উপযোগবাদী হিসেবে সিঙ্গার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে ক্লেশ ও যন্ত্রণা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর এ বক্তব্যও নতুন প্রশ্নের উদ্রেক করে। কোনো ক্লেশ বা যন্ত্রণা প্রতিকার করা নৈতিক। একইভাবে কাউকে ক্লেশের শিকার হতে দেওয়া কিংবা দীর্ঘস্থায়ী ক্লেশের শিকার হতে দেওয়া উভয়ই মন্দ ও অনৈতিক। এ দুটিই আমাদের প্রতিকার করা উচিত। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সিঙ্গার বলছেন, ক্ষুধা একইসঙ্গে রোগ ও দারিদ্র্য মানব ক্লেশ ও যন্ত্রণার জন্য দায়ী, আবার কখনো তা মৃত্যুরও কারণ। এজন্য সিঙ্গার প্রদত্ত নীতিটিকে আমরা একটি মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কারণ একজন ব্যক্তির সুখ বা অতি ভোগবাদী ভাবনা পরিহার করার ফলে যদি কারো ক্ষুধাও দারিদ্র্যের মতো ক্লেশ বিমোচন

করা যায় তাহলে আমাদের তাই করা উচিত। যদি কোনো ক্ষুধার্ত বা দরিদ্রজনের বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বা প্রতিকারে কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ ও সামর্থ্য না থাকে তাহলে আমরা যারা স্বচ্ছল তাদের নিকট প্রত্যাশা করব একাজে এগিয়ে আসবার জন্য।

কিন্তু, সিঙ্গারের প্রস্তাবনার কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাও আমাদের বিবেচনা রাখা উচিত। এরকম কয়েকটি দিক নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। প্রথমত, সিঙ্গার ক্ষুধাও দারিদ্র্যের কুফলকে ক্লেশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু, ক্লেশই কি ক্ষুধাও দারিদ্র্যের একমাত্র প্রতিফল। এর সঙ্গে ব্যক্তির বৌদ্ধিক সত্তা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ব্যক্তির মর্যাদাবোধের স্খলন ঘটে তাকে কি আমরা তুচ্ছ করে দেখব। অন্যদিকে ক্ষুধাও দারিদ্র্য স্বনিহিত অর্থে যে মন্দ তাও বিবেচনায় রাখা অবশ্যক। কেউ যদি মনে করেন কেবল কর্তব্যবোধই মৃত্যুকে প্রতিকার করতে সক্ষম তাদের দাবি মূলত "ক্ষুধা মন্দ" নীতির মতো সংকীর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, আমাদের মনে রাখতে হবে ক্ষুধা মন্দ একারণে যে তা জীবিত মানুষের মধ্যে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে থাকে, এটি ক্লেশেরও কারণ পাশাপাশি ব্যক্তির শারীরিক দুর্বলতা ও অমর্যাদারও কারণ। এজন্য ক্ষুধাও দারিদ্র্যকে মন্দ বিবেচনা করে তাকে নৈতিক কর্তব্যবোধের মাধ্যমে প্রতিকার করার গোটা বিষয়টি ভুল প্রকল্পের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বরং ব্যক্তির যন্ত্রণা/ ক্লেশ প্রতিকার করতে হবে একারণে যে এই প্রতিকারের সঙ্গে পৃথিবীর বৃহত্তর মঙ্গল সম্পৃক্ত। আবার যেসব জনগণ অভাবে রয়েছে তাদেরকে সাহায্য করা উচিত একারণে যে তারা প্রকৃতই অভাবে রয়েছে। কিন্তু যারা সাহায্য করে না তাদের তুলনায় যারা সাহায্য করে এ তুলনাটি পৃথিবীর মঙ্গলের ধারণায় কোনো প্রভাব ফেলছে এমনটিও নয়।

গরীব ও ক্ষুধার্তকে সাহায্য করা মানব মনস্তত্ত্বের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের কারণেই সম্ভব। মানুষের মধ্যে রয়েছে পরোপকার মানসিকতা, উদারতা, সহানুভূতি, সাহায্য, প্রেম ও সেবা। এটাও সঠিক,যে, প্রত্যেক নৈতিক মতবাদই অন্যদের সেবা ও পরিচর্যা করার কর্তব্য নীতির কথা বলে। এই নীতিসমূহ বিশেষ কিছু আত্মীয়তার সম্পর্কের (যেমন, ভাই বোন, পরিবারের সদস্য, বন্ধু এবং সহকর্মী) বাইরেও এই কর্তব্য পালন করার নৈতিক বাধ্যবাধকতার দাবি করে থাকে। আবার কাউকে মন্দ থাকতে দিব না এরকম দায়িত্ববোধও ক্ষুধা ও দারিদ্র্য প্রতিকারে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কিন্তু পিটার সিঙ্গার তাঁর নৈতিক তত্ত্বে যে পরামর্শ দেন তাহলো "তুমি যতোটুকু পারো" (as much as you can) নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এটি অনেকটা "আত্ম-উৎসর্গের র‍্যাডিকেল নীতিবদ্যার" উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রশ্ন হলো তাহলে আমরা কীভাবে ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচন করব। এ প্রসঙ্গে আমরা দুটি বিষয় বিবেচনা করতে পারিঃ

এক. যাদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে (যেমন, শিশু, স্ত্রী-স্বামী, সন্তান, ভাই-বোন, পিতা-মাতা, নিকট বন্ধুজন এবং গোত্রের সদস্য ইত্যাদি) তারা বিশেষ কারণে যত্ন ও পরিচর্যায় অগ্রাধিকার পাবে।

দুই. আমাদের অধিকার রয়েছে (কেউ হয়তো বলতে পারেন আমার নিজের প্রতি কর্তব্য) আমাদের নিজেদেও স্বার্থ সিদ্ধি করা। আমাদের নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হওয়া, কোনোপ্রকার প্রবণতা ব্যতিরেকই আমাদের নিজেদের আনন্দের জন্য কাজ করা।

ফিসকিন এটিকে বলেছেন, "a robust zone of indifference"। এ দ্বারা তিনি বোঝচ্ছেন, আমরা যা কিছু করি তা নৈতিকভাবে সমর্থিতও নয়, আবার নিষিদ্ধও নয়। আবার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো : "যত্ন/পরিচর্যা সম্পর্কিত কর্তব্য" এবং "মানব-কল্যাণ" । এ দুটিতে আমরা অবদান রাখতে পারি। কিন্তু, কোনো নীতিতেই সুনির্দিষ্ট কোনো পরামর্শ নেই যে আমাদেরকে একাজটি এভাবে করতে হবে। কোনো ব্যক্তি কোন কাজটি কীভাবে করবেন তার পেছনে অনেক ধরনের উপাদান রয়েছে, যেমন, ব্যক্তির সহনশীলতা, পরিবেশ পরিস্থিতি, জ্ঞান, সম্পূরক ভাবনা এবং অন্যদের নিকট থেকে আমরা কি ধরনের সাহায্য পাচ্ছি তাও বিবেচ্য বিষয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন স্বচ্ছল ব্যক্তির ইচ্ছা হলো অনেক দাম দিয়ে একটি স্পোর্টস গাড়ী কেনার জন্য। এখন অনেকেই হয়তো বলতে পারেন, গাড়ী কেনার জন্য তিনি এতো টাকা ব্যয় না করে ক্ষুধা দারিদ্র্য প্রতিকারে তিনি তা দান করতে পারতেন। কিন্তু ব্যক্তির যে পছন্দ ও মানসিক আকর্ষণ সেটার কী তাহলে কোনো মূল্য দিব না। এ বিষয়টিও কিন্তু বিবেচনার অংশ হিসেবে রাখতে হবে। তাহলে সিঙ্গারের প্রস্তাবিত মডেলে যে ত্রুটি রয়েছে কীভাবে আমরা তা দুর করতে পারি। এ পর্যায়ে আমি ত্রিমাত্রিক মডেল এর প্রস্তাবনা করব। এই মডেলটি এমনভাবে কাজ করবে একদিকে এটি গরীব ও ক্ষুধার্তদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে ধনীদের সাহায্য করার নৈতিক দায়বোধ করার পাশাপাশি অর্থনেতিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা খুব জরুরি। এই তিনটি দিকের উপর গুরুত্ব দি আমরা মডেলটির প্রস্তাবনা করছি:

ডায়াগ্রাম ৭ : ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনের ত্রিমাত্রিক মডেল

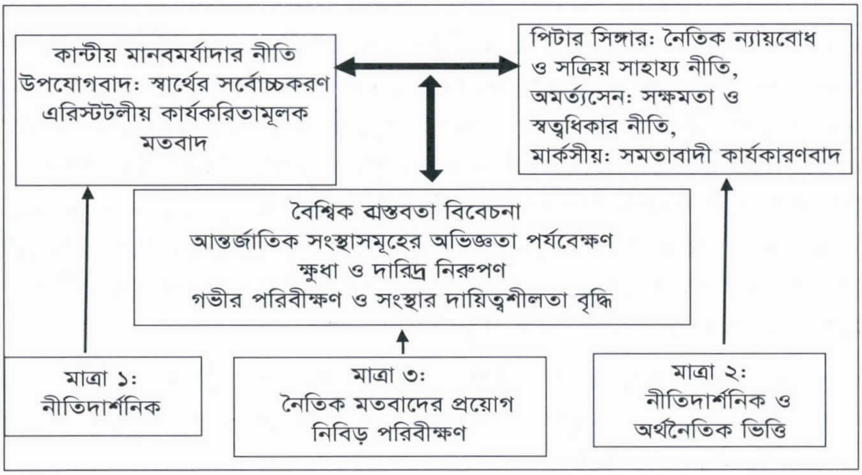

ত্রিমাত্রিক মডেলের প্রথম মাত্রায় ভূমিকা রাখবে নৈতিক নীতি ও মতবাদ, দ্বিতীয় মাত্রায় পিটার সিঙ্গার, অমর্ত্য সেন ও মার্কসীয় সমতাবাদী নীতি, তৃতীয় মাত্রায় এসব নীতির সমন্বয়ে অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বাস্তবতায় প্রয়োগ ঘটানো। এ বাস্তবতায় নৈতিক নীতির অনুশীলন যেমন থাকবে, তেমনি এসব নীতি প্রয়োগে যথাযথ পরিবীক্ষু রয়েছে কি-না তাও গুরুত্ব দেওয়া হবে। ত্রিমাত্রা গ্রহণ করার পেছনে আমরা বিবেচনায় রেখেছি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বৈশ্বিক বাস্তবতাকে। এটি বিচ্ছিন্ন কিংবা অঞ্চলভিত্তিক কোনো ইস্যু নয়। গোটা বিশ্বেও অর্থনৈতিক নীতি ও জীবনাচরণের সঙ্গে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য যুক্ত। মডেলটির বিস্তারিত নিচের ডায়াগ্রামে উপস্থাপন করা হলো :

ডায়াগ্রাম ৮: নৈতিকতার ত্রিমাত্রিক মডেল

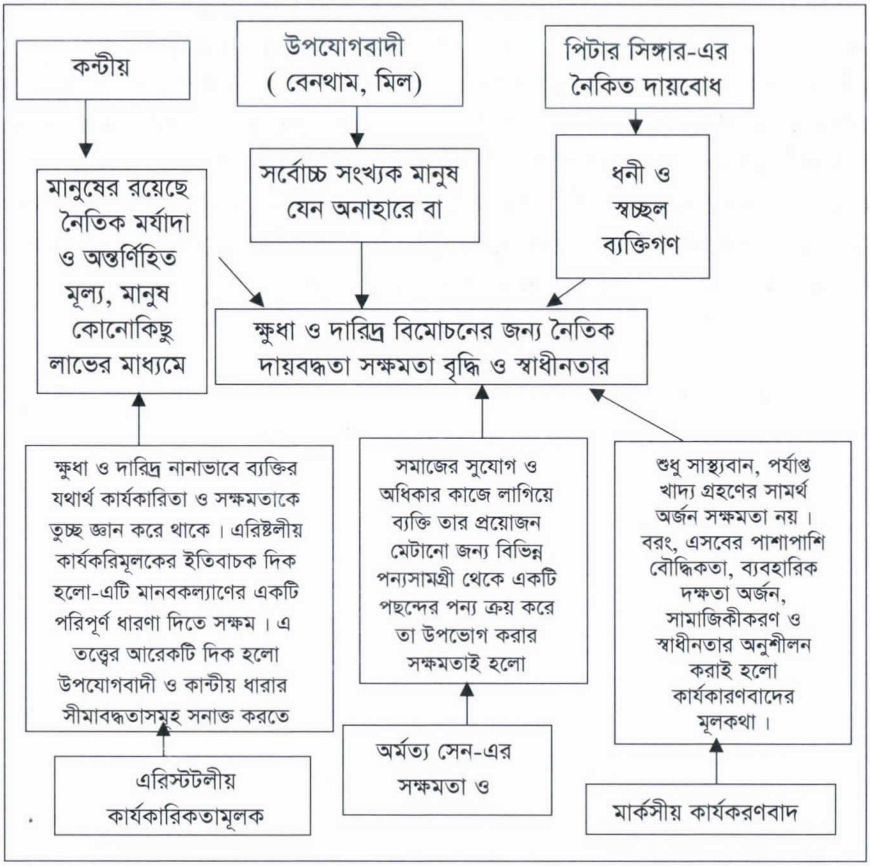

উপসংহার

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে পিটার সিঙ্গার-এর The Life You Can Save we বিস্তৃত নির্দেশনা দেখিয়েছেন। অর্থনৈতিক দর্শনের জন্য এটি উৎকৃষ্ট কৌশলও বলা যায়। চরম দারিদ্র্য

বিমোচনে আমাদের কী করা উচিত সে সম্পর্কে সিঙ্গারের যুক্তিসম্বলিত এ গ্রন্থটিতে চিন্তার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। অবশ্যই আমরাও সিঙ্গার-এর মতো বিশ্বাস করি জীবন হবে উচুঁ, আশা প্রত্যাশায় ভরপুর মানবিক জীবন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তার যথার্থ প্রতিফলনও মানুষজন উপভোগ করবে। তবে এটাও ঠিক শুধু বিত্তবানরা নৈতিক হলে, কিংবা ধনী রাষ্ট্রসমূহ তাদের আয়ের ক্ষুদ্র শতাংশ যদি ক্ষুধার্ত ও দরিদ্রদের জন্য ব্যায় করে তাহলে পৃথিবীতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থাকবে না। কিন্তু, যাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নেই, তাদের কী কিছুই করার নেই। যারা ক্ষুধাও দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে তারা যদি কর্মঠ হবার চেষ্টা চালায়, কিংবা বোদ্ধা ও বিজ্ঞজনদের প্রণীত ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল অনুসরণ করে তাহলেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করা যেতে পারে। এপ্রসঙ্গে হেনরি স্পিরা নামক একজন মহান মানুষের কথা বলা যায়। তিনি সারাজীবন ব্যায় করেছেন দারিদ্র্য ও লাঞ্ছিত মানুষদের অধিকার আদায়ের লড়াই সংগ্রামে। এজন্য ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যক্তির আত্মসচেতনতা, নৈতিক দায়বোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি খুবই জরুরি। এই জরুরি বিষয়টির উপর ভিত্তি করেই আমরা ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনে কতোগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে সমন্বয়ে একটি ত্রিমাত্রিক সমন্বিত মডেল দাড়ঁ করিয়েছে। এই মডেলটি একাধারে সামাজিক সমতা, মানব মর্যাদা, প্রয়োজন অনুসারে চাহিদা সক্রিয় করে তোলা ও তা মেটানোর সমক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধাও দারিদ্র্য বিমোচনে এগিয়ে আসতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে।

ক্ষমতা ডিসকোর্স এবং জ্ঞান: মিশেল ফুঁকোর ভাবনা

ড. আ. ক. ম জামাল উদ্দীন [১]

Abstract: *This paper explores the thoughts of Michel Foucault on how power, discourse and knowledge are interacting in human society. In his view, the power of individuals, groups and institutions in society always uses the knowledge in the purpose of their own necessities that constructs the truths leading to build discourses and episteme of deaths in human life, In fact, the construction of truth, knowledge, discourse and episteme in society are always bonded and controlled by the weaving of power rested in the elements of social structure. Foucault's idea of power use to produce the knowledge in society where it establishes discourses and that builds the truths and accordingly change the episteme and chains the human life everywhere. In his view, power has many dimensions and is spreaded over everywhere in human life. It is continuously moving through many parts of social structure that influences and changes the daily life of the society. In this way, Foucault is able to make him different from other contemporary thinkers and his new thoughts in explaining the power discourse and knowledge is recognized as the notion of postmodernity where individual power is all in all to perform everything in society. His idea of power is the key element to resistence and change the society.*

১. ভূমিকা

আন্তনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) বুদ্ধিজীবীদেরকে প্রথাগত (traditional) এবং সাংগঠনিক (organic) এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথাগত হচ্ছেন তারা যারা নিজের চিন্তা প্রচার করলেও সমাজ প্রগতিকে এগিয়ে নেয়ার ভূমিকায় নিরুত্তাপ থাকেন এবং সাংগঠনিক হচ্ছেন তারা যারা সমাজ পরিবর্তনে অগ্রসরমান শ্রেণীকে জয়ী করতে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। মিশেল ফুঁকো (১৯২৬-১৯৮৪) তাঁর তত্ত্বের মাধ্যমে ক্ষুদ্র একক ব্যক্তিকেই পরিবর্তনের নিয়ামক মনে করেছেন। মার্কসের মতো শ্রেণী আলোচনায় না গিয়ে এবং ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত হিসেবে চিন্তা করার বদলে দেখেছেন সর্বত্র বিরাজমান, একই সাথে ক্ষমতাশীলদের বিপক্ষে দেখেছেন প্রতিরোধ: "where there is power there is resistanse, and yet, or rather consequently, this resistance is never in a position of exteriority in relation to power…These points of resistance are present everywhere in power network. Hence there is no single focus of Great Refusal, no soul of revolt, source of all rebellions, or pure law of the revolutionary. Instead there is a plurality of resistance" (Foucault,

[১]অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

1980a: 95-6)। ব্যক্তি জীবনে তাত্ত্বিক ফুঁকো অনেক আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহন করেছেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকারও হয়েছিলেন কিন্তু যতো দূর জানা যায়, কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা শ্রেণী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হননি। অনেক মার্কসবাদীদের মতে, সে কারনেই ফুঁকো সাংগঠনিক নন বরং তাকে প্রথাগত বুদ্দিজীবী হিসেবে গণ্য করা যায়। ফুঁকো ১৯৫০ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করলেও আবার ১৯৫৩ সালে এসে তা ছেড়েও দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তায় মার্কসবাদ বাঁচে যেন জলের মধ্যে আছে। অন্যত্র আনলেই খাবি খায় (হোসেন, ২০০৭)। তবে ফুঁকো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন, সেশন পর্যন্ত গিয়েছেন এককথায় ক্ষমতার বিপরীতে দাড়িয়ে ক্ষমতাকে প্রদর্শন করেছেন। ফুঁকো তার তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতাকে বুঝতে চেয়েছেন আর তা করতে গিয়ে প্রশ্ন উথাপন করেছেন অনেক বেশী, কিন্তু উত্তর দিয়েছেন অনেক কম । ফুঁকো দেখিয়েছেন ক্ষমতা তার নিজ্স্ব প্রয়োজনে জ্ঞানকে ব্যবহার করে। সেখানে নির্মিত হয় সত্য, গড়ে ওঠে ডিসকোর্স, মৃত্যু এপিসটেমের। Foucault তার The Order of Things গ্রন্থে Episteme সম্পর্কে বলেন: "However, if in any given culture and at any given moment, there is always only one episteme that defines the conditions of possibility of all knowledge, whether expressed in a theory or silently invested in a practice. (Foucault, 1973:168)"

ফুঁকো তাঁর কাজের মাধ্যমে আমাদেরকে দেখিয়েছেন এমন এক মালাকে যার ফুলগুলো (জ্ঞান, সত্য, ডিসকোর্স, এপিসটেম) ক্ষমতা নামক সুঁতোয় আটকানো। ফুঁকোর 'ক্ষমতা' উৎপাদন করে জ্ঞানের, যেখানে প্রতিষ্ঠা পায় ডিসকোর্স, তৈরী হয় সত্য, পরিবর্তন হয় এপিসটেমের, আর শৃঙ্খলিত হয় মানব। মার্কস যেখানে বলছেন ক্ষমতার দ্বিপাক্ষিকতার কথা, সেখানে ফুঁকো বলেছেন ক্ষমতা বহুপাক্ষিক, ক্ষমতা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র এবং তা সঞ্চারণশীল। আর এর মাধ্যমেই ফুঁকো তাঁর সময়ের চিন্তার প্রভাব থেকে নিজেকে বাহিরে নিয়ে যান, তৈরী হয় নতুন এক ধারার যার নাম উত্তরাধুনিকতা যেখানে ব্যক্তিই সর্বেসর্বা, ক্ষমতার ধারক, সেই সংগে প্রতিরোধ। ফুঁকো তাঁর আলোচনাকে বিস্তৃত করেছেন জনস্বাস্থ্য থেকে পাগলামি, জ্ঞান থেকে যৌনতা, নিয়ম থেকে শাস্তি প্রভৃতির মতো ব্যাপক পরিসরে আর তা করতে গিয়ে জন্ম দিয়েছেন 'আর্কেওলজি অব নলেজ, ডিসিপ্লিন এন্ড পানিস, দ্য বার্থ অব দ্য প্রিজন, দ্য অর্ডার অব থিংস, অ্যান আর্কেওলজি অব হিউম্যান সায়েন্স এর মত দুনিয়া কাঁপানো প্রকাশনা। আন্তনিও গ্রামসির আলোচনা যেমন 'hegemony' ছাড়া হয় না, মার্কসের আলোচনা যেমন 'class' ছাড়া হয় না, সাঁর্ত্রের আলোচনা যেমন 'existentionalism' ছাড়া হয় না, তেমনি ফুঁকোর আলোচনা 'power' ছাড়া হয় না। আর 'power' এর আলোচনা 'knowledge' এবং 'Discourse' ছাড়া পূর্ণাঙ্গ হয় না

২. ফুঁকোর জীবনাচরণ

উক্ত চিন্তার বিপরীতে চিন্তা করেছেন, সত্যের বিপরীতে দাড়িয়ে সত্যকে খুজেছেন, ভিন্ন আঙ্গিক থেকে বিচার করেছেন জ্ঞানকে। জন্ম ফ্রান্সের ছেট শহর পোয়াতিতে, ১৯২৬

সালের ১৫ অক্টোবর। বাবা পল মিশেল ফুঁকো থেকে পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে নিজের নাম থেকে 'পল' অংশটুকু বাদ দিয়ে পরিচিত হয়েছেন মিশেল ফুঁকো নামে। প্রথা ভাঙ্গার শুরুটা এখানেই থেমে থাকেনি, রীতি অনুযায়ী পরিবারের ইচ্ছায় চিকিৎসকের খাতায় নিজের নাম লেখাননি, সমাজের বিধিনিষেধের বাইরে গিয়ে হয়েছেন সমকামী এবং আজীবন তাঁর এই কামপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করেছেন। আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন বহুবার, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী করতে চেয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে আত্নহত্যাকে অধিকার হিসেবে দাবি করেছেন, চেয়েছেন তার প্রয়োজনীয় আইনানুগ স্বীকৃতি। এতসব ব্যতিক্রম নিয়ে যে ব্যক্তি মিশেল ফুঁকো, তাঁর বেড়ে উঠার পটভূমি বিশ্বযুদ্ধ- যে সময়ে হিটলারের নাজিবাহিনীর রণহুংকারে ফ্রান্স বিপর্যস্ত যার প্রভাব ফুঁকো নিজেই ব্যক্ত করেছেন এভাবে: 'যুদ্ধের আতঙ্ক ছিল আমাদের প্রেক্ষাপট, অস্তিত্বের কাঠামো' (হোসেন, ২০০৭: ১৫)। ব্যক্তিগত জীবনে নিজের প্রচেষ্টায় ভর্তি হয়েছেন প্যারিসের নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একোল নর্মাল সুপিরিয়র এ। শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন আলতুৎসারের মতো ব্যক্তিকে, ছাত্র হিসেবে পেয়েছেন জ্যাক দেঁরিদাকে আর নিরীক্ষক হিসেবে পেয়েছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় জর্জ কাগিলেমকে। সমসাময়িক চিন্তাজগতে ক্রিয়াশীল চিন্তাকে আঘাত করে নিজের চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আঘাত করেছেন সার্ত্রের অস্তিত্ববাদকে। মুগ্ধ পাঠক ছিলেন প্লাতো, দেকার্ত, কান্ট এবং স্পিনোজার মতো দুনিয়াজোড়া খ্যাতিমান পন্ডিতদের। হাইডেগারকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে খোজ পেয়েছেন নীটশের। মার্কসবাদ বা অস্তিত্ত্ববাদ নয় ভালোবাসা দেখিয়েছেন হেগেল এবং নীটশের প্রতি। চরমপন্থী মাওবাদী দফের সঙ্গে শারীরিক ভালোবাসা গাঁটছাড়া বাঁধার পর ফুঁকো আগের চেয়ে অনেক বেশী সামাজিক হয়ে উঠেছিলেন এমনকি রাস্তায় প্রতিরোধ আন্দোলনও করেছিলেন, যদিও সমর্থন ছিল ইজরাইলের দিকে আবার ইরানের ধর্মভিত্তিক বিপ্লবকে খোলা মনেই দেখেছেন । এইচ আইভি পজিটিভ জানার পরেও সানফ্রান্সিসকোর সমকামি বারগুলোতে ছুটে গিয়েছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন এইডস এর জীবাণু। এক অদম্য, একরোখা জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন, নোয়াম চমস্কি বারবার বলেছেন: "ওই ভদ্রলোকের মত অনৈতিক মানুষ আর দেখিনি।"(হোসেন, ২০০৭:৬৫)। ফুঁকোর মৃত্যুর পর তার সমকামী বন্ধু ঔপন্যাসিক গিবের (২৯) একটি উপন্যাস লিখেন যেখানে প্রতীকীভাবে হলেও ফুঁকোকেই খুজে পাওয়া যায়। গিবের উপন্যাসের নাম রাখলেন 'আ লামি ফিন মা পা সোভে না ভি' (সেই বন্ধুর প্রতি যে আমার প্রাণ বাঁচায়নি)। গিবের তাঁর উপন্যাসে তিনটি মানসিক চিত্রপটকে তুলে ধরেছেন। প্রথমটিতে বালক ফুঁকোর চোখের সামনে শল্যচিকিৎসকের পা কেটে ফেলার বীভৎস দৃশ্য, যদিও ফুঁকোর বাবা আশা করেছিলেন এতে করে ছেলের পুরুষত্ব বলশালী হবে। দ্বিতীয়টি, ফুঁকোর মনের ভেতরের একান্ত তোলপাড় যে তাঁর ইহুদি সহপাঠীরা তাঁর অভিশাপেই হারিয়ে গেছে। তৃতীয়ত, এক উন্মাদ নারী যে বন্দী অবস্থায় তার ঘরের দেয়ালে লিখে রেখেছে, 'সুন্দরের জন্ম দিতে হলে প্রেম নয়, স্বাধীনতা নয়-অবিনাশী একাকীত্বের ভিতর এক ভূগর্ভসহ কারাকক্ষে তোমাকে বাঁচতে হবে, মরতে হবে...."(হোসেন, ২০০৭: ৭৮)।

৩. ক্ষমতা সম্পর্কে ফুঁকোর ভাবনা

ফুঁকো তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কিত আলোচনায় অনেক বেশী প্রভাবিত হয়েছেন নীটশের দ্বারা। মার্কস যেখানে গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থনীতিকে, সেখানে ফুঁকো গুরুত্ব দিলেন প্রতিষ্ঠানকে। ফুঁকো দেখালেন ক্ষমতা কিভাবে উৎপাদিত হয় এবং সঞ্চালিত হয়। ফুঁকোর আগ্রহ ছিল ক্ষমতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্ত্বা কেন্দ্রিক (micro politics of power)। ফুঁকো বললেন: "ক্ষমতা কোনো এক জায়গায় থাকে না, শিরা উপশিরা ধরে বহমান রক্তপ্রবাহের মতো সমাজ দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় "(খান, ২০০৫:২৯)। অর্থাৎ ক্ষমতার বিচরণ সর্বত্র, মার্কসের মতো ফুঁকো ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেননি বা রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করেননি। ফুঁকো ক্ষমতাকে ভেঙ্গেছেন এবং ঠিক এমনভাবে দেখিয়েছেন, যেমনভাবে মানুষের শিরা উপশিরায় রক্ত প্রবাহিত হয়। এর মাধ্যমে ফুঁকো এতদিন ধরে চলে আসা গ্রান্ড নেরেটিভকে প্রত্যাখান করেছেন। মার্কস গুরুত্ব দিলেন ঐক্যকে আর ফুঁকো আবিষ্কার করলেন পার্থক্য। ফুঁকো ক্ষমতার একপাক্ষিকতা বা দ্বিপাক্ষিকতা নয়, তিনি বলেন বহুপাক্ষিকতার কথা, অনুসন্ধান করেছেন পার্থক্য, বলেছেন ক্ষমতা সর্বময়। এর মধ্য দিয়ে এটা পরিস্কার যে, তিনি তাঁর তত্ত্বের মধ্য দিয়ে মার্কসের মতো বিপ্লবের পথে হাটছেন না, বরং সংঘবদ্ধ ও প্রতিরোধের তত্ত্বকে অকেজো প্রমান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ কারণে গোঁড়া মার্কসবাদীদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন প্রচুর, তিনি বুর্জোয়াদের রক্ষা করতে চান এই অভিযোগও উঠে এসেছে তাঁর বিরুদ্ধে। "ক্ষমতা যেহেতু খন্ডে খন্ডে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তার বিরুদ্ধে দাড়াবার জায়গাটা কোন নির্দিষ্ট থাকবে না, থাকবে সর্বত্র। ব্যক্তিকেই লড়তে হবে শেষ পর্যন্ত। এই মতবাদ উত্তর আধুনিকতা বলে পরিচিত এবং এককালে এনজিও ব্যবসার যে বিপুল উত্থান তা এর দ্বারা বেশ ভালোভাবেই সমর্থিত। (বেনজীম খান, ২০০৫: ২৯)। ফুঁকোর কর্মের অনেক বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে সমাজকাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির মধ্যে বিরাজমান আন্ত:সম্পর্ক ও তার রূপ। তিনি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ককে বলছেন ক্ষমতার সম্পর্ক। ফুঁকো তাঁর The History of Sexuality (1978), Power and Knowledge (1980), The Birth of the Clinic, Discipline and Punish (1997) সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন কিভাবে সমাজের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং একই সাথে তার বিপরীতে প্রতিরোধ সক্রিয় থাকে। ফুঁকোর মনোভাব ক্ষমতা এমন কিছুই নয় যা শুধুমাত্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তার সাথে নিপীড়ণ এবং চাপ প্রয়োগও যুক্ত থাকে। ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিত্য যোগাযোগের মধ্যে রয়েছে ক্ষমতার চালিকাশক্তি। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেন। ফুঁকো এতদিন ক্ষমতাকে যে শুধুমাত্র নেতিবাচক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই প্রথা ভাঙলেন এবং বললেন যে, দমন-পীড়ন এর মধ্যে দিয়ে হলেও ক্ষমতা নতুন কিছু তৈরী করে অর্থাৎ ক্ষমতার দমন এবং নিপীড়নের যে নেতিবাচক চরিত্র তা ফলদায়ক। ফুঁকো ক্ষমতার এই

রূপের কথা বললেন তাঁর The History of Sexuality, vol.1 (১৯৯৮) গ্রন্থে। ফুঁকো বলেন, "giving rise to new forms of behavior rather than simple closing down or censoring certain forms of behavior" (Mill, 2004: 33)

ফুঁকো ক্ষমতার প্রচলিত নেতিবাচক ব্যাখ্যায় বা আলোচনায় ঠিক ততটা উৎসাহী ছিলেন না যতটা উৎসাহী ছিলেন প্রতিরোধের প্রতি। ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্ষমতার সংজ্ঞায়ন করেন এভাবে: "Power is something which is performed something more like a strategy than a possesion, Power should be seen as a verb rather than a noun, something that does something, rather than something, which is or which is can be held onto.' (The History of Sexuality, Vol. 1, 1998)। ফুঁকো আরও বলেন, "Power must be analysed as something which circulates, or as something which only functions in the form of a chain....power is employed and exercised through net like organization.... Individuals are the vehicles of power, not its point of application." (Foucault 1980: 98)। এর মাধ্যমে ফুঁকো ক্ষমতাকে বৈশিষ্ঠমন্ডিত করলেন 'চেইন বা নেট' হিসেবে যা একটি সম্পর্কের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে সমাজের অভ্যন্তরে বিস্তৃত হয়, যা শুধুমাত্র শাসক এবং শোষিতের সর্ম্পকের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় না। দ্বিতীয়ত, ফুঁকো বলেন, ব্যক্তিকে ক্ষমতার খেলায় সাধারণ গ্রহীতা হিসেবে বিবেচনা করা সঠিক নয়, বরং ব্যক্তি এমন এক স্থান যেখানে ক্ষমতা সংগঠিত হয় এবং বাঁধারও সম্মুখীন হয়। ক্ষমতাকে বিবেচনা করতে হবে এমন কিছু হিসেবে যা ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হয় এবং বিদ্যমানভাবে অর্জিত থাকবে না। ফুঁকো যুক্তি দেখান, ক্ষমতা কতগুলো সর্ম্পকের এমন এক সমষ্টি যা, সমাজের কোনো স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যেমন রাষ্ট্র বা সরকারে পুঞ্জীভুত থাকার চেয়ে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। ফুঁকো এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "I am not referring to power with a capital, dominating and imposing its rationality upon the totality of the social body. In fact, there are power relations. They are multiple; they have different forms, they can be in play in family relations or within an institution, or an administration" (Foucault 1988c: 38)। প্রথমদিকের মার্ক্সিস্ট তাত্ত্বিকদের মতো ফুঁকো ক্ষমতাকে নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠান যেমন: সেনাবাহিনী অথবা পুলিশে কেন্দ্রীভূত বিবেচনায় না নিয়ে ক্ষমতার স্থানিক রূপকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিবেচনায় নিয়েছেন ব্যক্তি ও অন্যান্য এজেন্সীর সাথে এর ঐকমত্যের প্রক্রিয়াকে। ক্ষমতা সর্ম্পকে ফুঁকোর দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি প্রথাগত মার্ক্সিস্ট এবং নারীবাদী ক্ষমতার মডেলের বিপরীতে, যা কিনা ক্ষমতাকে শুধুমাত্র শোষণ এবং দমনের রূপ হিসেবে বিবেচনা করে। আর ফুঁকো একে বলছেন 'Repressive hypothesis'। পাশাপাশি তিনি ক্ষমতাকে দেখছেন উৎপাদনশীল (productive) হিসেবে যা কিনা বিভিন্ন আচরণ এবং

ঘটনাসমুহের রূপ গঠন করে। স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ এবং ব্যক্তিকে বাধ্য করে। তিনি বলেন, "If power was never anything but repressive, if it never did anything but say no, do you really believe that we should manage to obey it?" (Foucault, 1978: 36)

উপরোক্ত প্রশ্ন উথাপনের মাধ্যমে ফুঁকো বলেন, নিশ্চয়ই এখানে দমন-পীড়নের ব্যতিক্রম এমন কিছু রয়েছে যা মানুষকে একমতে আনে। এ বিষয়ে ফুঁকো তার The History of Sexuality গ্রন্থে স্বমেহন (musterbation) সম্পর্কে নিরুৎসাহিতকরণ নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফুঁকো সাবজেক্ট এবং ক্ষমতার সম্পর্ককেও আলোচনা করেছেন যাকে তিনি বলছেন "Anti-authority struggles". dzuকো বলেন, "Opposition of the power of men over women, of parents over children, of psychiatry over the mentally ill, of medicine over the population, of administration over the ways people live" (Foucault 1982:211). উপরিউক্ত সকল সংগ্রামকেই ফুঁকো স্থানীয় (local) বিবেচনা করেছেন, যেখানে বর্তমান জীবন অবস্থানের সমালোচনা এবং অসন্তুষ্টির প্রকাশ রয়েছে। ফুঁকো বলেন, "The main objective of these struggles is to attack not so much such and such an institution of power, or group, or elite, or class, but rather a technique, a form of power." (Foucault 1982: 212)। ব্যক্তি মানুষ গঠনে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে ফুঁকো গভীরভাবে সচেতন ছিলেন তথাপি তিনি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ককে শুধুমাত্র বা একমাত্র নিপীড়ণ বা মনোভাব সংদমনের সম্পর্ক হিসেবে দেখা থেকে বিরত থেকেছেন: "In an analysis it is necessary to look at the way in which institutions operate and the way that they are constrained also by the demands and resistance of individuals within the organizations as well as individuals and groups outside it." (Sara Mills, 2004: 50)

৪. ফুঁকোর আলোচনায় ডিসকোর্স প্রত্যয়ের ব্যবহার

ফুঁকোর তাত্ত্বিক আলোচনায় বহুল ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের মধ্যে ডিসকোর্স একটি, যা নানাভাবে পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা প্রদান করে। ফুঁকো নিজেই তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এই স্ববিরোধীতা তৈরী করেছেন এবং একে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন যা আলোচিত হয়েছে তাঁর --The Archaeology of Knowledge (1972) and `The Order of Things (1981) নামক দুটি বিখ্যাত বই এ। ফুঁকো 'আর্কেওলজি অব নলেজ' গ্রন্থে ডিসকোর্সকে উল্লেখ করেছেন এভাবে: The general domain of all statements, sometimes as an individualized group of statements, and sometimes as a regulated practice that accounts for a number of statements." (Foucault 1972: 80).

ফুঁকো 'the general domain of all' এর মধ্য দিয়ে বুঝাতে চাইলেন যে, 'ডিসকোর্স কে ব্যবহার করা যেতে পারে বাচন সমূহের এবং উক্তিসমূহের সমষ্টি হিসেবে যা তৈরী করা হয়েছে, এবং যার নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে প্রভাবও। কখনো কখনো তিনি বলেছেন, 'individualizable groups of statement' এর কথা যেমন: বর্ণবাদ। পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন, 'regulated practices that account for a number of statements' অর্থাৎ অলিখিত নিয়মসমূহ এবং কাঠামোসমূহ যা নির্দিষ্ট বাচন এবং বিবৃতি তৈরী করে। ডিসকোর্স হচ্ছে বিবৃতিসমূহের এমন এক নিয়ন্ত্রিত গুচ্ছ যা অগ্রকথনযোগ্য বা ভবিষ্যৎ বাচ্য উপায়ে অন্যান্য বিষয়সমূহের সাথে যুক্ত থাকে। ডিসকোর্স নিয়ন্ত্রিত হয় কতগুলো গুচ্ছবদ্ধ নিয়ম দ্বারা যা পরিচালিত করে কতগুলো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য এবং উক্তির বন্টন এবং প্রদর্শণের প্রতি। কিছু বিবৃতি বা উক্তি প্রদক্ষিত হয় প্রশস্ত আকারে, আর বাকীরা সীমাবদ্ধভাবে। মার্ক্সিস্ট তাত্ত্বিকেরা 'ভাবাদর্শ' প্রত্যয়টিকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট ধারণা এবং বিবৃতি বুঝাতে ব্যবহার করেন, যা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যক্তির চিন্তায় প্রভাব বিস্তারের সম্পর্ক রাখে। কিন্তু ডিসকোর্সের গতিপথ ভাবাদর্শের গতিপথ থেকে অধিকতর জটিল। ডিসকোর্স ব্যক্তির উপর সুনির্দিষ্ট চিন্তাসমূহ আরোপ করার সরল কোনো বিষয় থেকে ভিন্নতর। ফুঁকো বলেন, "Discourse are not once and for all subservient to power or raised up against it, any more than silences are. We must make allowances for the complex and unstable process whereby discourse can be both an instrument and an effect of power, but also a hindrance, a stumbling block, a point of resistance and a starting point for an opposing strategy. Discourse transmits and produces power; it reinforces it, but also undermines it and exposes it, renders it fragile and makes it possible to thwart it" (Foucault 1978: 100-101)। মার্ক্সিস্ট ভাবাদর্শ সবসময়ই নেতিবাচক হিসেবে অনুমিত হয়েছে, যা কতগুলো ভ্রান্ত বিশ্বাসের সমষ্টি। অন্যদিকে ফুঁকো বলছেন, এটি একই সঙ্গে নিপীড়ন এবং প্রতিরোধের হাতিয়ার। ডিসকোর্স প্রত্যয় বিবেচনায় ভাষার সমার্থক নয় এবং বাস্তবতার সাথে ডিসকোর্সের খুব সামান্যই সম্পর্ক রয়েছে এমনটি ভাবাও উচিত নয়। ডিসকোর্স শুধুমাত্র বাস্তবতাকে ভাষাতেই প্রকাশ করে না; অধিকন্তু এটি একটি সিস্টেম, যেটি আমাদের বাস্তবতাকে বোঝার ক্ষেত্রকে কাঠামোবদ্ধ করে। ফুঁকো বলেন, "We must not imagine that the world turns towards us a legible face which we would only have to decipher; the world is not the accomplice of our knowledge; there is no prediscursive providence which disposes the world in our favoor." (Foucault 1981: 67)। উপরিউক্ত বক্তব্য আরো জোরালো হয়, যখন ফুঁকো বলেন: "We must conceive of discourse as a violence which we do to things, or

in any case or a practice which we impose on them; and it is in this practice that the events of discourse find the principle of their regularity" (Foucault, 1981: 67)। ফুঁকো বলেছেন, ডিসকোর্সকে এমনকিছু হিসেবে বিবেচনা করা উচিত যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্ররোচিত করে। ফুঁকো প্রায়শই বলতেন কোনো কিছুই ডিসকোর্সের বাইরে নয়, সমস্ত কিছুই তৈরী হয়েছে ডিসকোর্সের মাধ্যমে। সমষ্টি হিসেবে পৃথিবী ডিসকোর্স এবং কাঠামোর মাধ্যমে আমাদের চিন্তার উপর জ্ঞান আরোপ করে। পৃথিবী সম্পর্কে চিন্তায় বিভিন্ন রীতির অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করি এবং একই সঙ্গে ঘটনাসমূহকেও পর্যবেক্ষণ করি; এটি আমরা সংগঠিত করি বিরাজমান কাঠামোসমূহের মধ্যে থেকে এবং ব্যাখ্যা করার চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আমরা এই কাঠামোকে চর্চার মাধ্যমে স্বত:স্বিদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করি, যাতে করে একে প্রশ্নবিদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফুঁকো তাঁর ডিসকোর্সের আলোচনায় গুরুত্ব দিয়েছেন চাপ এবং বিধিনিষেধের প্রতি, তিনি দেখিয়েছেন আমাদের বলার ক্ষেত্রে বাক্যগঠনের প্রক্রিয়ার নানা প্রকৃতির; আমাদের নানারকমের বাক্য ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে এ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে তার ব্যবহার খুবই সীমিত এবং সংকীর্ণ। তিনি একে ব্যাখ্যা করলেন এভাবে, "Delimitation of a field of objects, the definition of a legitimate perspective for the agent of knowledge and the fixing of norms for the elaboration of concepts and theories" (Foucault, in Bouchard 1977: 199)। ফুঁকো বলেছেন, ডিসকোর্সের প্রারম্ভে কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকে যেমন মানুষ যখন কথোপকথনের মধ্যে থাকে তখন সে কোনো সিরিয়াস কথা বলার পূর্বে কুশলাদি বিনিময়ের মাধ্যমে তার বক্তব্য শুরু করে কিন্তু এই প্রাত্যহিক বিষয়গুলি প্রায়শই আমরা খেয়াল করি না কিন্তু যখনই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে তখন আমরা একে গুরুত্ব দিই। ডিসকোর্স সংক্রান্ত আলোচনায় ফুঁকোর আগ্রহ ছিলো এটি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেটি দেখা। তিনি বলেন, "In every society the production of discourse is at once controlled, selected, organized and redistributed by a certain number of procedures whose role is to ward off its powers and dangers, to gain mastery over its chance events, to evade its procedures, formidable materiality" (Foucault, 1981: 52)। ফুঁকো বলেন, যে সকল কার্যপ্রণালী ডিসকোর্সকে চাপ দেয় এবং ডিসকোর্সকে ডিসকোর্স করে তোলে তার প্রথমটি হলো কার্যবিধির গুচ্ছ যাকে তিনি দেখিয়েছেন-তিনটি বাহ্যিক বর্জন দ্বারা গঠিত। এই তিনটি হলো: টাবু (taboo), পাগল এবং প্রকৃতস্থের সাথে অপ্রকৃতস্থের মধ্যকার পার্থক্য, এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার পার্থক্য। ডিসকোর্স তৈরীতে এই তিনটি বাহ্যিক বর্জন বা নিষিদ্ধ জিনিষের সাথে ফুঁকো আরও চারটি বর্জনের অন্ত:স্থ কার্যবিধির কথা জানান, যেগুলো হলো: বিররণী, রচয়িতা, শৃঙ্খলা এবং কথ্যবিশেষের মুখস্তকরণ। এই সকল কার্যপ্রণালীর বিবেচ্য বিষয়

ডিসকোর্সকে শ্রেণীভূক্ত করা, ভাগ করা এবং বিন্যস্ত করা; তাদের মূল কাজ কথা বলার অধিকার যারা পেয়েছে আর যারা পায়নি তাদের মধ্যে পার্থক্য করা; যে সকল ডিসকোর্স ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর যে সকল ডিসকোর্স ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়, সেগুলোকে চিহ্নিত করা। এ প্রসংগে ফুঁকো বলেছেনঃ "There is in all societies, with great consistency, a kind of gradation among discourses: these which are sad in the ordinary course of days and exchanges, and which vanish as soon as they have been pronounced; and those which give rise to a certain number of new speech acts which take them up, transform them or speak of them, in short, those discourses which, over and above their formulation, are said indefinitely, remain said, and are to be said again." (Foucault 1981: 57). সুতরাং ডিসকোর্সের বিবেচনা করা উচিত বিবৃতি বা বাচনসমূহের একটি সামগ্রিক টার্ম বা প্রত্যয় হিসেবে, এমন এক নিয়ম হিসেবে, যার ভেতরে ঐ বাচনসমূহের জন্ম হয় এবং নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ সকল বাচনসমূহ সঞ্চালিত হয় অথবা বাদ পড়ে। ডিসকোর্সের তাত্ত্বিক আলোচনায় ফুঁকো নিয়ে আসেন এপিসটেমি, আর্কাইভ এবং ডিসকার্সিভ ফরমেশন বা অনিঃশেষ আলোচনা এবং বাচন বা বক্তব্য। ফুঁকো ডিসকার্সিভ ফরমেশন বা অনিঃশেষ আলোচনার বিভিন্নভাগ পর্যালোচনা করেছেন এবং একই সময়ের বিভিন্ন ডিসকোর্সের মধ্যকার বিরাজমান সম্পর্ককে অধ্যয়ন করেছেন। কোনো কিছু সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখার এই চর্চাকে ফুঁকো বলছেন এপিসটেমি। তাঁর ভাষায়, "The episteme is not a sort of grand underlying theory, it is a space of dispersion, it is an open and doubtless indefinitely describable field of relationships" (Foucault, 1991: 55).

একটি সময়ের (period) জানা সকল বিষয়ের যোগফল ডিসকোর্স নয়, বরঞ্চ এটি হচ্ছে জ্ঞানসমূহের মধ্যকার সম্পর্কসমূহের একটি জটিল রূপ-যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা অধ্যায়ে তৈরী হয, এবং নিয়ম-যার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহলে আমরা দেখতে পাই নির্দিষ্ট সময় বা পর্যায়কালের অভ্যন্তরে নানাবিধ সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য, ঠিক যেভাবে ধারণাগত (conceptual) এবং তত্ত্বগত (theoretical) পর্যায়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্রিয়াশীল থাকে, বিভিন্ন ধরণের বিষয়বস্তুগত (subject matter) পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যেমনটি ফুঁকো তাঁর 'The Order of Things' (১৯৭৩) বইয়ে গবেষণা পদ্ধতি, তাত্ত্বিক কাঠামো, ধারণাকল্প নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানকে একই আলোচনায় টেনে এনে দেখিয়েছেন এবং সেখানে তিনি এগুলোর সাদৃশ্যও দেখিয়েছেন। এ প্রসংগে ফুঁকো বলেছেন, "What was common to the natural history, the economics and the grammar of the classical period was certainly not present to the consciousness of the scientists, or that part of it that was conscious was superficial, limited and almost fanciful, but unknown to themselves, the naturalist,

economists and grammarians, employed the same rules to define the objects proper to their own study, to form their concept, to build their theories (Foucault, 1973: xi)। ফুঁকোর যুক্তিতে এক এপিসটেমি থেকে অন্য এপিসটেমিতে গন্তব্যে বাচনের অবসান বা ছেদ ঘটে যা আকস্মিক, যদিও তাকে বৈশিষ্টমন্ডিত করা হয় পূর্বতন সময়ের বা ধারার বিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া হিসেবে। ফুঁকো জানতে চান, "How can it be that there are at certain moments and in certain orders of knowledge these sudden take offs, these hastenings of evaluation, these transformations which do not correspond to the calm and continuist image that is ordinarily accepted?" (Foucault 1979: 31)। ফুঁকোর প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনায় মহাফেজখানা গুরুত্ব পেয়েছে এবং বলা হয়েছে: The set of rules which at a given period and for a given society define ….the limits and forms of the sayable"(Foucault, 1991: 59)। আর্কাইভ বা মহাফেজখানা প্রত্যয়টিকে ফুঁকো ব্যবহার করেছেন অলিখিত নিয়ম বুঝাতে, যা কতগুলো নির্দিষ্ট বিবৃতি বা বাচন তৈরী করে এবং যার যোগফল হিসেবে যে কোনো একটি সময়ে অনি:শেষ আলোচনা চলতে থাকে। আর ডিসকার্সিভ ফরমেশন (discursive formation) বা অনি:শেষ আলোচনা বলতে বুঝিয়েছেন নির্দিষ্ট কতগুলো বিবৃতি বা অনুষঙ্গকে যার সাথে সম্পর্ক রয়েছে প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষমতার, এবং তা প্রভাব বিস্তার করে ব্যক্তি ও তার চিন্তার উপর। এটি কতগুলো বিবৃতি বা বক্তব্যের সমষ্টি যা একই বিষয়ে অনুসন্ধান চালায় এবং একই রকমের প্রভাব তৈরী করে। স্টেটমেন্ট (statement) বা বিবৃতিকে অধিকার বা ক্ষমতার বলে প্রাপ্ত উক্তি বা কর্ম হিসেবে দেখা যেতে পারে, আর সেটি হয় বাচনের মাধ্যমে। বিবৃতি মানেই শুধু কোনো ভাষাগত বাক্য নয়, সেটি হতে পারে কোনো মানচিত্র বা ছবি। প্রত্যেকেই এই স্টেটমেন্ট বা বিবৃতির অধিকারী হয় না এবং অন্যেরটা সহজভাবে গ্রহণ করে না। কিন্তু স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি অন্যটির থেকে অধিক ক্ষমতা বা কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়ে থাকে। এটি নির্ভর করে ক্ষমতার সাথে বা প্রতিষ্ঠানের সাথে তার সম্পর্কের উপর। ফুঁকো যেটিকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, সেটি হলো: "The law of existence of statements, that which rendered them possible,,.the conditions of their singular emergence" (Foucault, 1991: 59)। ফুঁকো ডিসকোর্সকে দেখেছেন নৈর্ব্যক্তিক ব্যবস্থা হিসেবে, যা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যায়। ডিসকোর্স নিয়ন্তা হয়ে দাড়ায় এই সম্বন্ধে যে কোনো বক্তব্যটি বলা সম্ভবপর, পাশাপাশি এর শর্তসমুহের অধীনে নিরুপিত হয় কোন বক্তব্য সত্য ও সঠিক হিসেবে পরিগণিত হবে।

৫. জ্ঞান সম্পর্কে ফুঁকোর আলোচনা

মিশেল ফুঁকো তাঁর অনেক লেখাতেই ক্ষমতা ও জ্ঞান এবং ক্ষমতা ও সত্যের মধ্যকার অন্যান্য সংযুক্ততা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এমন এক প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন

যেখানে জ্ঞানের উত্থান বা উৎপত্তি পান্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে সরল উপায়ে সংগঠিত হয না, বরঞ্চ সমাজের বিভিন্ন চর্চা এবং প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার মাধ্যমে তা তৈরী হয় এবং অব্যাহত থাকে। তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে নানা লেখায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেখানে কতিপয় গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদাই ক্রিয়াশীল। ফুঁকো আলোচনা করেছেন আমরা কোনো কিছু কিভাবে জানি, এবং কোন প্রক্রিয়ায় আমাদের এই জানা কোনো কিছু প্রকৃত ঘটনা হয়ে ওঠে। ফুঁকোর আগ্রহ ছিল এটি দেখা যে সমসময়ের অন্যান্যগুলোকে বাদ দিয়ে কিভাবে নির্দিষ্ট কিছু ডিসকোর্সের জন্ম হয়। ঠিক একইভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই বাদপড়া বা বর্জনের জায়গাটিকে অনুসন্ধান করেছেন। তিনি তাঁর Power and Knowledge (১৯৮০) এ বলেছেন, নির্দিষ্ট কোনো ডিসকোর্সকে প্রকৃত বা সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অন্যান্যগুলোর বা বাদবাকিদের সমভাবে গ্রহণযোগ্য বক্তব্যকে সন্দেহজনক করে তুলতে হবে এবং তাকে অস্বীকার করতে হবে। ফুঁকো মূলত আগ্রহী হয়েছেন বিমূর্ত প্রাতিষ্ঠানিক এই প্রক্রিয়াকে বুঝতে যা কোনকিছুকে প্রকৃত বা সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। জ্ঞান বিশেষত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, এটি তৈরী হয় ক্রমান্বয়ে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায় এমন প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দ্বারা যেমন: আইনস্টাইন। তারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছেন এমন ব্যতিক্রম মানুষ হিসেবে যারা তাদের সময়ে প্রচলিত ধারণার সীমা অতিক্রম করেছিলেন। পাশাপাশি সম্পুর্ণ নতুন ধারণার এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির গোড়াপত্তন করেছিলেন। ঠিক একইভাবে যেমন হেগেল দার্শনিক চিন্তাকে তার সময় থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে ভাঙলেন এবং গড়লেন। তেমনিভাবে ফুঁকো তার আলোচনাক্ষেত্রে অন্যান্যদের থেকে আলাদা হয়ে যান। 'জ্ঞান' আলোচনার মাধ্যমে ঠিক যেমনটি হান্টার বলছিলেন: 'Foucault's reformation of the concept of discourse derives from his attempts to provide histories of knowledge of what men and women have thought. Foucault's histories are not histories of ideas, opinions or influences nor are they histories of the way in which economic, political, and social contexts have shaped ideas or opinions. Rather they are reconstructions of the material conditions of thought or knowledges. They represent at attempt to produce what Foucault calls an archaeology of the material conditions of thought/knowledge, conditions which are not reducible to the idea of `consciousness 'on the idea of mind .(Hunter, cited in Kendall and Wickham 1999:35): কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কোন বিষয়টি আমরা জানতে পারছি তা দেখার চেয়ে ফুঁকোর আগ্রহে অনেক বেশী ছিল 'দি ম্যাটেরিয়াল কন্ডিশনস অব থট ' অর্থাৎ ঐ প্রক্রিয়াটিকে জানা যে প্রক্রিয়ায় কতিপয় বিষয়কে আমাদের কাছে পরিচিত করে তোলা হয় এবং অন্য বিষয়কে আড়াল করা হয়। এর মাধ্যমে পরিচিতটিকেই আমাদের কাছে সত্যতায় পর্যবসিত করা

হয়। ফুঁকো পশিচমা তাত্বিকদের লেখা জ্ঞানোর ইতিহাস পাঠ করার চেয়ে এবং তাকে মেনে নেয়ার চেয়ে যে সিদ্ধান্তটি নিলেন "Determine in its diverse dimensions, what the mode of existence of discourse (their rules of formation, with their conditions, their dependencies, their transformations) must have been Europe since the 17th century, in order that the knowledge which is ours today could come texist, and more particularly, that knowledge which has taken as its domain this curious object which is man" (Foucault 1991:70). যেহেতু তিনি জ্ঞানের গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনায় উদ্যোগী ছিলেন যে প্রক্রিয়ায় জ্ঞান অস্তিত্বলাভ করে বা উৎপাদিত হয়। আর তা করতে গিয়ে বললেন এপিসটেমের পরিবর্তন হয়, পুরোনো এপিসটেমের নতুন এপিসটেমের আবির্ভাব ঘটে ঠিক যেমনভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে ল্যাবরেটরীতে রাসায়নিক গবেষণার পরিবর্তে মানব বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় মানুষ নিয়ে অনুসন্ধান যেমনটি হয় মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে। "Classical thought and all the forms of thought that preceded it, were able to speak of the mind and the body, of the human being, of how restricted a place [s/] he occupies in the universe,, of all the limitations by which [her/] his freedom must be measured, but not one of them was able to know man as [s/] he is posited in modern knowledge, Renaissance 'humanism' and classical 'rationalism' were indeed able to allot human beings a privileged position in the order of the world, but they were not able to conceive of man (Foucault 1970:318). তাই ফুঁকো সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের মতো বিষয়ের স্বপ্রকৃতি জানতে চান এবং একই সকল বিষয়ের আগমনের পূর্বে মানুষ কিভাবে ভাবত মানবসত্ত্বা বা মানবজাতি সম্পর্কে। তিনি বিশ্লেষণ করতে চান কিভাবে মানুষ অবজেক্ট এ পরিণত হয়। পাওয়ার/প্রিভিলিজ গ্রন্থে জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করেছেন ক্ষমতা সম্পর্কসমূহের সংযোজক হিসেবে। 'প্রিরিয়ণ টক' নামক রচনায় ফুঁকো বলেন, "It is not possible for power to be exercised without knowledge, it is impossible for knowledge not to engender power" (Foucault 1980:52).

যেখানেই বিরাজমান গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্ষমতার সম্পর্কে ভারসাম্যহীনতা রয়েছে সেখাকেন উৎপাদন ঘটবে। পশ্চিমা দেশসমূহে ঠিক যেমনটি ফুঁকো বলেছিলেণ নারী এবং পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্যহীনতা থাকায় সেখানে নারীদেরও সম্পর্কে তথ্য উৎপাদিত হচ্ছে। আর তাই লাইব্রেরী বা ছাপাখানায় পুরুষের তুলনায় নারীকে নিয়ে অনেক বেশী বই; অনেক বেশী লেখা ও অনেক বেশী আগ্রহ। ঠিক একইভাবে প্রযোজ্য নিম্নআয়ের মানুষদের বেলায় মধ্যবিত্তের ব্যাপারে নয়, কালো মানুষের বেলায় সাদা মানুষের নয়, সমকামিতার ব্যাপারে তাই অন্য স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার চেয়ে।

ফুঁকো জ্ঞানকে দেখছেন বিমূর্ত শক্তি হিসেবে যা নির্ধারণ করে দেয় আমরা কী জানব, একজন পন্ডিত আমাদের কী জানাবেন তার চেয়েও। তিনি বলেন, "The subject who knows, the objects to be known and the modalities of knowledge must be regarded as so many effects of [the] fundamental implications of power knowledge and their historical transformation. In short it is not the activity of the knowledge, the processes and struggles that traverse it, and of which it is made up that determines the forms and possible domains of knowledge. (Fouult 1991-27-28).

Critical theory/intellecetual theory' নামক সাক্ষাৎকারে এবং দি হিস্ট্রি অব সেক্সুয়ালিটি' গ্রন্থে ফুঁকো বলেন ১৯৬০ এর দিকে পশ্চিম এ এই মত গড়ে উঠতে শুরু করে যে নিজের সম্পর্কে সত্য জানতে হবে । যখন আমি ভাবব যে আমি নিজের সম্পর্কে সত্য আবিষ্কার করেছি পাশাপাশি এটি্ও বুঝতে হবে যে আমার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করছি সেখানে ব্যক্তি নিজেই সাবজেক্ট । ফুঁকো বলেছেন,'If I tell the truth about myself…it is in part that I am constituted as a subject across a number of power relations which are exerted over me and which I exert over others' (Foucault 1988:39). ফুকোর ক্ষমতা উল্লেখ করতে হলে তিনটি বিষয়ের অবতারণা করতেই হয় ১. সার্বভৌমত্ব বা সভারেনটি ২.অনুশাসন বা ডিসিপ্লিন ৩.প্রশাসনিকতা বা গভর্নমেন্টালিটি। আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট সার্বভৌমত্ব। এই সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র স্বীকৃতি আদায় করে এবং এই স্বীকৃতি ততদিন পর্যন্ত বজায় থাকে যতদিন পর্যন্ত তার সার্বভৌম ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে পারে। রাষ্ট্র যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠান এবং ফুঁকো তার 'ক্ষমতা' আলোচনায় প্রতিষ্ঠানের মেকানিজমকে গুরুত্ব দিয়েছেন ক্ষমতা সঞ্চালনের প্রক্রিয়ায় সুতরাং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বা এর চরিত্রটি নিরুপন করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। একটি সময় ছিল যখন রাষ্ট্র এবং রাজাকে পৃথক করা যেত না; রাজার আদেশ ঈশ্বরের আদেশ, রাজা ঈশ্বরের প্রতিভূ ছিলেন। তখনও এই ক্ষমতার প্রয়োগ হত যার জন্য সেনা থাকত, নিয়ম থাকত, আইনও থাকত এবং সর্বোপরি শাস্তি । বর্তমানের রাষ্ট্রের আইনের ছকে মানুষ বাধা, কাঠামোই বলে দেয় শাস্তি কিরূপ হবে যেমন পশ্চিমা দন্ডবিধি আর বাংলাদেশের দন্ডবিধি এক নয়। যদিও এই প্রক্রিয়া ব্যক্তির সম্পকের্র জ্ঞান উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেকে সাবজেক্ট হিসেবে গঠন করে ব্যক্তি ডিসকোর্সও সাবজেক্ট হয়েই থাকছে ।

৭. ক্ষমতা, ডিসকোর্স এবং জ্ঞানের আন্ত:সম্পর্ক: ফুঁকোর বিশ্লেষণ

ফুকো বলেছিলেন, তার গ্রন্থগুলো হবে মলোটিভ ককটেলের মতো। তা ফাটবে, স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে শেষ হয়ে যাবে : থেকে যাবে তার সূচিত আগুন: তা কিছু আলোকিত করবে, কিছু পোড়াবে, নতুন আলোকায়নের সম্ভাবনা জিইয়ে রাখবে (সম্পাদিত, ২০০৭, পৃ: ১০৪)। ফুঁকো এই কাজটি করেছেন তার ক্ষমতা, ডিসকোর্স ও জ্ঞানের আলোচনার

মাধ্যমে। ফুঁকো ক্ষমতা ও জ্ঞানকে সমার্থক করেছেন এই তিনটি প্রত্যয়ের জোরালো সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং মানব কিভাবে শৃঙ্খলিত হয়। ফুঁকো তার ক্ষমতা সম্পর্কিত আলোচনায় তার জীবদ্দশায় নানাভাবেই স্ববিরোধী করে তুলছেন। ব্যক্তি ক্ষমতা প্রয়োগের লক্ষ্য নয় বাহন আবার পরেই বলেছেন ব্যক্তিই ক্ষমতা প্রয়োগের মূল ও একমাত্র উদ্দেশ্য। ফুঁকো নিজেকে কাঠামোবাদী পরিচয় দিতে চাননি তথাপিও তার সম্পর্কে আলোচনা ও কাঠামোতে গিয়েই আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটায় যা মানব তার মনের অভ্যন্তরেও গড়ে দেওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে বৈধতা দেয়। এর ব্যতিক্রম ও আছে যেহেতু ফুঁকো বলছে সবকিছুই ক্ষমতার সম্পর্ক: যেখানে প্রতিরোধ নেই বুঝতে হবে সেখানে ক্ষমতার সম্পর্কও নেই আর তাই দেখতে পাই রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের বাইরেও কিছু মানব বেরিয়ে আসে যেহেতু ক্ষমতা সর্বত্র। আইনবিরোধী আন্দোলন; এমনকি রাষ্ট্রের ব্যবচ্ছেদ ঘটে। বর্তমান সময়ের ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাওবাদী আন্দোলন তুমুল আলোচিত। সেখানে রাষ্ট্র তার এই উল্লেখিত ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যস্ত। তবে ফুঁকোর ক্ষমতা সম্পর্কিত আলোচনা অনেক নীরস হয়ে যায় তখন যখন ফুঁকো প্রশ্নেই নিরুত্তর থাকেন। ফুঁকো বিপ্লব সম্ভব বলে মনে করতেন না যেহেতু তিনি বলেছেন ক্ষমতা সর্বত্র এটি বিমূর্ত। ইচ্ছে করলেই মার্ক্সবাদী ধারণার মতো ক্ষমতা দখল বা ত্যাগ করা যায়না। আর ফুঁকোর ক্ষমতা মার্ক্সবাদের মতো অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেনা ; ফুঁকোর ক্ষমতা আলোচিত হয ভিন্ন আঙ্গিকে, সর্ম্পকের সাথে সর্ম্পক জাল বিস্তারের মাধ্যমে। আর এটি শুধুমাত্র সভারেনটিতেই সীমাবদ্ধ নয়, দ্বিতীয়ত রয়েছে অনুশাসন বা ডিসিপ্লিন। সভারেনটির বা সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে যখন ফুঁকো নিজেই বলেন: ক্ষমতার চিহ্ন একে দেয়ার স্থান হলো 'মন'[...] ধারণা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে (ব্যক্তির)দেহের নিয়ন্ত্রণ' কৌশল: ফুঁকোর বিশ্লেষণ দেখার আলোকপর্বে শাস্তির মানবিক পোশাকের আড়ালে রয়েছে আরো ভালোভাবে শাস্তি প্রদান, সমাজদেহের আরো গভীরে ক্ষমতা পূতে দিয়ে আইন ও শাস্তিকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। (হোসেন, ২০০৭, পৃ:৯৭)

আর্জেন্টাইন সাহিত্যিক হোর্হে লুইস বোর্হেসের একটি গল্প ফঁকো পাঠ করেন তার 'দি অর্ডার অব থিংস' রচনায়। সেখানে চীনা এনসাইক্লোপেডিয়ার বরাত দিয়ে জীবজন্তুরও অদ্ভুত, দ্ব্যর্থক শ্রেণীবিভাজন বলা হয়েছে: ক. সম্রাটের মালিকাধীন, খ. সুগন্ধিময়, গ. পোষমানা, ঘ. চোষা শূকর, ঙ. সুকণ্ঠী চ. বিশালাকার, ছ. ভবঘুড়ে কুকুর জ. বর্তমান শ্রেণীবিভাজনে অন্তর্ভুক্ত, ঝ. পাগলা ধরনের, ঞ. অগুনতি, ট. চমৎকার উট-লোম ব্রাশ দিয়ে আকা জন্তু, ঠ. ইত্যাদি ড. কলসি ভেঙ্গেছে যেগুলো ঢ. দূর থেকে দেখতে পতঙ্গের মতো মনে হয় যেসব জন্তু। ফুঁকো বুবাতে চাইলেন শ্রেণীবিভাজন বিভিন্ন মানদন্ডে বিভিন্ন রকম হতে পারে। কোনোটিই চূড়ান্ত নয়। কিন্তু দেখলেন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিজের মতো শ্রেণীকরণ করতে চায় তার জন্য প্রয়োজন হয়ে দাড়ায় জ্ঞানগত ভিত্তি, চিন্তাধারার সীমানা ও শৃঙ্খল নির্ধারণ, অভিজ্ঞতার বিন্যাস আরোপক মূল সাংস্কৃতিক সংকেতসমূহ নির্ধারণ। এখানেই ক্রিয়া করে ডিসিপ্লিন বা অনুশাসন। ফুঁকোর প্রান-অপটিসিজম তত্ত্ব এখানে খুবই

প্রাসঙ্গিক। মানুষ অনুশাসনের মাধ্যমে শৃঙ্খলিত করতে নজরদারি বজায় রাখতে গড়ে ওঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সামরিক বাহিনী, অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন, ধর্মপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। রাষ্ট্র বা ব্যবস্থা এই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান আরোপ করে, চিন্তা করতে শেখায়, নিয়ম বুঝায় এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবন ছকে আবদ্ধ করে; মানব হয় অদৃশ্য শৃঙ্খলিত দৃশ্যত কতগুলো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠান তৈরী করে নিজের প্রয়োজনে। আর ফুঁকো এর মধ্যে দেখছেন মানুষের স্বাধীনতাহীনতা যেখানে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মানুষের অনিঃশেষ চাহিদার অনিঃশেষ প্রাপ্তিতে স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করেন। ফুঁকো ক্ষমতার তৃতীয় মাত্রাকে বলছেন গভর্নমেন্টালিটি; ফুঁকো নিজের তৈরী করা শব্দ যা বাংলায় বহু জায়গায় স্থান পেয়েছে প্রশাসনকেন্দ্রিকতা হিসেবে। এখানে বাকি দুটি তীরধার থেকে ব্যতিক্রম; এখানে ক্ষমতার প্রয়োগ জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য। যেমন রাষ্ট্রব্যবস্থায় পিছিয়ে পরে বা অনগ্রসর বা সুবিধাবঞ্চিতদের কল্যাণের জন্য এই ক্ষমতার প্রয়োগ হবে। যেমন কৃষকদের উৎসাহ দিতে বা বাচিয়ে রাখতে কৃষি ভর্তুকি দেয়া হয়, চাকরিতে বিভিন্ন কোঠার প্রয়োগ করা হয়; নারীদেরকে নানাভাবে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করা হয় আবার ভারতে একইভাবে মাওবাদীদের উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব দিতে বলা হচ্ছে অর্থাৎ সভারেনটি ক্ষমতার পরিবর্তে গভর্নমেন্টালিটির ক্ষমতার প্রয়োগ গুরুত্ব দিতে বলা হচ্ছে এবং এটি চলছেও। আবার কোথাও কোথাও প্রথমটি অধিক ব্যবহৃত হচ্ছে যেমনঃ সন্ত্রাসবাদ দমনের ক্ষেত্রে । ফুঁকো দেখতে পাচ্ছেন জ্ঞান/ক্ষমতা, ডিসকোর্স পাশাপাশি হাত ধরেও চলছে একে অন্যের সাহায্যও নিচ্ছে। ফুঁকো জ্ঞান এবং ক্ষমতাকে সমার্থকই করেছেন ঠিক যেমনভাবে বলছেন সত্য হচ্ছে একধরনের ক্ষমতা। ফুঁকো দেখাচ্ছেন কিভাবে ডিসকোর্সের জন্ম হয়, তহার থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে তৈরী হয় সত্য। ফুঁকো বলছেন মানুষকে শৃঙ্খলিত করতে ডিসকোর্সকে নির্দিষ্ট করে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়না। প্রতিষ্ঠিত ডিসকোর্সের মাধ্যমে সে জ্ঞান আমরা পরে তাকে একসময় সত্য পরিগণিত করি এবং বর্জিত ডিসকোর্সগুলো আমাদের কাছে সনেদহজনক এবং মিথ্যাও বটে। কিন্তু ফুঁকো দেখাচ্ছেন কিভাবে ঈশ্বরকেন্দ্রিক ভাবনা ভেঙ্গে মানবজ্ঞানের সূত্রপাত; এবং সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা; কিভাবে সময়ের পরিক্রমায় এপিসটেমের পতনের মধ্যে দিয়ে নতুন জ্ঞানের শুরু হয়। যেমন আধুনিক যৌনবিজ্ঞানের মাধ্যমে যৌনতা নিয়ন্ত্রণ, পাগলামি নিয়ন্ত্রণ, জেলখানার মানসিক উৎকর্ষ বর্ধনের কাজ ও শাস্তি প্রদানের ধরণ। আর এই সমস্ত কিছুর অণুঘটক ক্ষমতা যা একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগঠিত হয় যেখানে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাই ফুঁকোর আলোচ্য এবং তাই অতি অবশ্যই স্টেট।

৮. উপসংহার

বিদ্যৎ সমাজে ফুঁকোকে খাটো করতে গিয়ে বারবার মার্কসকেও খাটো করা হয়েছে এমনকি ফুঁকো নিজেও মার্কসের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। মার্কস যেখানে বিপ্লবকে সম্ভবজ্ঞান করে এবং তার রূপ আঁকেন সংগঠিতভাবে সেখানে ফুঁকো অনেক

বেশী অরাজনৈতিক হয়ে ওঠেন; এবং বিপ্লব সম্ভব নয় বলে মনে করেন। কারণ মার্কস যেখানে ক্ষমতা কে দখল বা ত্যাগ করা যায় মনে করছেন ফুঁকো তা করছেন না। ফুঁকোর ক্ষমতা বিমূর্ত, এটি সভারেনটি, ডিসিপ্লিন এবং গভর্নমেন্টালিটি এই তিন ধাপে ক্রিয়াশীল। সাথে ঢাল তলোয়ার হিসেবে রয়েছে ডিসকোর্স ও জ্ঞান। ফুঁকো সমস্ত কিছুকেই ডিসকোর্সের আওতাধীন করেছে আর যে প্রক্রিয়ায় দেখিয়েছেন জ্ঞানের মাধ্যমে তার স্বাধীনতাহীনতার তাই প্রশ্ন ওঠে ফুঁকো কি নৈরাজ্যবাদী? আবার ফুঁকো কি বুর্জোয়াদের পক্ষে? ফুঁকো কি কাঠামোবাদী? ফুঁকো কোনটিই স্বীকার করেননি। ফুঁকো অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন প্রক্রিয়া। তিনি বারবার তার আলোচনায় প্রক্রিয়া টেনেছেন। কিন্তু ফুঁকো তার প্রক্রিয়ায় আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু বারবার মার্কসকেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন। মূলত দুজনের ক্ষমতার ব্যাখ্যা ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণেই আর তাদের ব্যাখ্যা এক জায়গায় এসে মিলতে পারেনি তাই প্রতিরোধের ব্যাখ্যাটিও মিলবে না সেটিও স্বাভাবিক। কিন্তু ফুঁকো বলছেন ক্ষমতা সর্বত্র এবং এর স্থানীয় রূপ আছে এবং এটি বিমূর্ত। আর তাই ব্যক্তিকেই পরিবর্তন আনতে হবে, যেমন: বদলে যাও বদলে দাও। কিন্তু ফুঁকোর ক্ষমতা তত্ত্ব কি পারে ভারতের ক্রমর্ধমান মাওবাদী আন্দোলনের সম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ কোনো ব্যাখ্যা দিতে? বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া সন্ত্রাসবাদের কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে। আর তাই ফুঁকোর আলোচনায় মার্ক্স ঠিক যেমনভাবে মার্কসের আলোচনায় ফুকোও আসেন। দুজনের ব্যাখ্যা ভিন্ন কিন্তু অবজেকটস খুব বেশী ভিন্ন নয়। এই দুইজনকে চমৎকারভাবে ধারণ করেন এডওয়ার্ড সাঈদ। যেটি ফুঁকোই চেয়েছিলেন তার আলোচনা আরও নতুনের জন্ম দিবে। ফুঁকো প্রথাবিরোধী হলেও সমাদৃত হয়েছেন তাঁর জীবদ্দশাতেই। হুমায়ুন আজাদের মতো তাঁকে বলতে শোনা যায়নি, "আমি জন্ম নিয়েছিলাম অন্যদের সময়ে ।"

গ্রন্থপঞ্জি:

পারভেজ হোসেন সম্পাদিত (২০০৭), মিশেল ফুকো: পাঠ ও বিবেচনা, ঢাকা: সংবাদ প্রকাশনা

বেনজিম খান সম্পাদিত (২০০৫), এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাইদ: আবিশ্ব বিবেকের কণ্ঠসর, ঢাকা: সংবাদ প্রকাশনা।

Foucault, Michel (1972), The Archaeology of Knowledge, New York: Hoper Colophen.

Foucault, Michel (1973), Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason, New York: Vintage Books.

Foucault, Michel (1973), The Order of Things: An Archaeology of Human Science, New York: Vintage, Random House.

Foucault, Michel (1978), The History of Sexuality: An Introduction, Volume 1 London: Penguine Books.

Foucault, Michel (1980), Power and Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Colin Gordon (ed.), New York: Pantheon Books.

Foucault, Michel (1981), 'The Order of Discourse' in Robert Young (ed.) Untying the Text: A Post-Structuralist Reader, London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Foucault, Michel (1988), Technologies of The Self, The University of Massachusetts Press.

Foucault, Michel (1991), Discipline and Punish: The Birth of the Prison, England: Penguin Books.

Gramsci, Antonio (1971), The Prison Note Books, London: Lawrence & Wishart

Mills, Sara (2004), Michel Foucault, London: Rutledge

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাংলার যশোর জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনঃ একটি পর্যালোচনা

*ড. মোঃ আমিরুল ইসলাম **

Abstract: *From the ancient period till advent of the British, 'village' kept being the smallest association of different states in Bengal as well as in the Indian sub-continent. This 'village' was meant the 'self-sufficient village community'. In those days, local government administration was actually vested with 'Morol' the leader of the village. But a comprehensive change took place in local self-administration after the British had occupied India. The present article deals with the steps taken in local self-administration during the British period in India. To serve the purpose, self-administration of greater Jessore district under the British rule has been analyzed.*

রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক সময় প্রশাসনিক কার্যাবলীকে একাধিক ইউনিটে বিভক্ত করে থাকে। এ বিভক্তি প্রক্রিয়াকে দুটি ভাগে চিহ্নিত করা যেতে পারে; এর একটি হচ্ছে কেন্দ্রীকরণ, অপরটি বিকেন্দ্রীকরণ। সরকারের নিম্ন পর্যায় হতে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সংকোচন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীকরণ বলে; এবং যখন কেন্দ্র থেকে ক্ষমতা নিম্ন পর্যায়ের প্রশাসনিক স্তরে বিস্তৃত করা হয়, তখন তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে। অর্থাৎ এটি কেন্দ্রীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার তখন কিভাবে নিম্নস্তরের প্রশাসনিক ইউনিটগুলো নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হবে তার জন্য প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরী করে। প্রাচীন বাংলায় তিন ধরনের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলো হলো- কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ক্ষমতা ও প্রতিযোগিতামূলক স্থানীয় সরকার। ঐ সময় রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম সংস্থা ছিল গ্রাম। গ্রামের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করতো গ্রাম প্রধান বা মোড়ল। এছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন পেশার মানুষের উপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হতো। এ সময় কৃষি ও হস্তশিল্পের সমন্বয়ে গ্রামগুলো অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠে। ফলে এক ধরনের স্বায়ত্তশাসনের উদ্ভব হয় যার কিছু কিছু নিদর্শন মুসলিম শাসন আমলেও ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা ক্ষমতা দখলের পর নিজেদের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য প্রচলিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোকে অবজ্ঞা করে নিজেদের দেশের প্রশাসনের অনুকরণে

* সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, উত্তরা, ঢাকা

কোন জেলা বা অঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা আলোচনার মাধ্যমে একটি দেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। সে উদ্দেশ্যে যশোর জেলার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা আলোচনার জন্য মনোনিত করা হয়েছে।

যশোর জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কি এবং ব্রিটিশ পূর্ববর্তী বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা দেওয়া প্রাসঙ্গিক। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হচ্ছে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত কোন ক্ষুদ্র এলাকার সরকার ব্যবস্থা। এ সরকার ব্যবস্থার শীর্ষে কেন্দ্রীয় এবং নিম্নে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার। গ্রামীণ প্রশাসনিক স্তরগুলো মূলত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে যখন স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা না হয়ে এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তা স্বায়ত্তশাসন হিসেবে আখ্যায়িত হয়। [১]স্থানীয় সরকার সরকারি কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত হলেও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সদস্য বা প্রতিনিধিবৃন্দ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানোত্তরকালে অধিকাংশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিনিধিবৃন্দ সরকারি কর্মকর্তা দ্বারা মনোনীত বা নির্বাচিত হতো। এ মনোনয়নের প্রক্রিয়াটি গ্রামীণ ও নগর উভয় স্তরে কার্যকরী ছিল।

বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামো একদিনে গড়ে উঠেনি। অনেক ধাপ বা স্তর অতিক্রম করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার একটা নির্দিষ্টরূপ লাভ করেছে; এর পিছনে রয়েছে সুদূর প্রসারী ইতিহাস। মনু, কৌটিল্য, শুক্রাচার্য প্রমুখের রচনাবলী থেকে ভারতের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনামলে গ্রামগুলো স্বাধীন ছিল। গ্রামের প্রধান পরিচালক ছিলেন গ্রামিক। [২]অনুরূপভাবে মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকেও প্রাচীন ভারতের পৌর স্বায়ত্তশাসনের ধারণা পাওয়া যায়। [৩]মুসলমানদের আগমনের প্রাথমিক পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের তেমন চিত্র মেলে না। তবে বখতিয়ার খলজীর লখনাবতী বিজয়ের পর তাঁর অধিকৃত অঞ্চল বিভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি অঞ্চলে একজন করে সেনাপতি নিয়োগ করেন। প্রত্যেক বিভাগকে ইকতা এবং ইকতার শাসনকর্তাকে মূকতা বলা হতো। [৪]বখতিয়ার খলজীর মৃত্যু-পরবর্তী বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে কোন স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু জালাল উদ্দীন আবুল মুজাফফর শাহের (১৪৮১-১৪৮৬ খ্রি.) সোনারগাঁ শিলালিপিতে। [৫]থানা এবং সাতগাঁ শিলালিপিতে (১৪৮৪ খ্রি.)। [৬]আরসাহ, থানা ও মহল নামে প্রশাসনিক বিভাগের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৫ খ্রি.) সিলেট শিলালিপি (১৫০৫খ্রি.) ও সোনারগাঁ (১৫১৫খ্রি.) শিলালিপিতেও ইকলীম ও মহলের উল্লেখ আছে । [৭]এসব শিলালিপির উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, সুলতানি আমলের

ইকলীম, আরসাহ্, শিক, মহল, থানা প্রভৃতি প্রশাসনিক ইউনিটের অস্তিত্ব ছিল যা বর্তমানের বিভাগ, জেলা, মহকুমা (বর্তমানে জেলা) এবং থানার সাথে তুলনীয়। এ প্রশাসনিক বিভাজন ব্যতীত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী থেকে।[৮]মোগল শাসকরা ছিলেন শহরমুখী। তাঁরা স্থানীয় বা গ্রামীণ শাসনের প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাঁরা প্রশাসনিক সুবিধার কথা বিচেনা করে সমগ্র শাসন কাঠামোকে সুবা, সরকার, পরগণা এবং মহলে বিভক্ত করেন।[৯]এ বিভাগগুলোকে বর্তমানের প্রদেশ, জেলা, থানা এবং ইউনিয়নের সাথে তুলনা করা হয় যা সুলতানি আমলের প্রশাসনিক বিভাজনের সঙ্গেও অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। মোগলরা গ্রাম্য বা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেননি। স্থানীয় সকল বিষয় সমাধানের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল জনগণের উপর।[১০]জনগণ তাদের মনোনীত গ্রাম প্রধানের মাধ্যমে স্থানীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশাচার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি মীমাংসা করতো।[১১]গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রাম পরিষদ। এই গ্রাম পরিষদ পঞ্চায়েত নামে পরিচিত ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও বর্ণ ভিত্তিক হতো। অনেক সময় সমগ্র গ্রামের জনসাধারণের জন্য একটি পঞ্চায়েত গঠিত হতো। আর্থিক স্বচ্ছলতা, আভিজাত্য, বয়স এবং অন্যান্য গুণাবলী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো।[১২]গ্রামবাসী কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়ে প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো। অত:পর সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতো।[১৩]কোন প্রস্তাবের পক্ষে সদস্যরা উচ্চস্বরে সম্মতি দান করতো। এ সম্মতি দান পদ্ধতিকে নির্বাচন হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। কোন জরুরি বিষয় মীমাংসার জন্য গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতো। এছাড়া অনেক উপ-কমিটি ছিল যারা প্রত্যেকেই পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করতো। উল্লেখ্য, এ সময় গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন অফিস বা কাচারী ছিল না। গ্রাম প্রধান বা মোড়লের বাড়িতে কিংবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে সাধারণত সভা-সমাবেশ হতো। মুকাদ্দম গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি ছিলেন। তিনি অনেকটা বেসরকারি কর্মচারীর মত ছিলেন। গ্রাম থেকে আদায়কৃত রাজস্বের ২.৫ ভাগ নিজের বেতন হিসেবে গ্রহণ করতেন।[১৪]বস্তুত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন স্থানীয় বেসরকারি কর্মকর্তা। পঞ্চায়েতের সভাপতি উপরের সকল কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।

মোগল সম্রাট আকবর-এঁর মন্ত্রী রাজা টোডরমল ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলাকে ১৯টি সরকারে এবং ৬৮২টি মহলে বিভক্ত করেন।[১৫]১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে এ মহলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫০ হয়।[১৬]মাহমুদাবাদ ছিল সুবা বাংলার সরকারগুলোর মধ্যে অন্যতম।[১৭]সুলতানি বাংলার মাহমুদাবাদ শহরের নাম অনুসারে মোগল আমলে মাহমুদাবাদ নামকরণ হয়েছিল বলে মনে হয়।[১৮]নলদী, সাতৈর, মাহমুদশাহী, নসরতশাহী প্রভৃতি এর মহল ছিল।[১৯]মাহমুদাবাদে মহলের সংখ্যা ছিল ৮৮। বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে

বলা যায় যে, সরকার মাহমুদাবাদের উত্তরে সরকার বারবাকাবাদ, উত্তর-পূর্বে বাজুহা সরকার, দক্ষিণে খলিফাতাবাদ সরকার, পূর্বে ফতেহাবাদ সরকার এবং পশ্চিমে সাতগাঁ সরকার। [২০]কাজেই এটা বলা অসমীচীন হবে না যে, আলোচিত অঞ্চলের মধ্যে উত্তরে মাহমুদাবাদ সরকার, দক্ষিণে খলিফাতাবাদ সরকারের কিছু অংশ এবং পূর্বে ফতেহাবাদ সরকারের অংশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে বৃহত্তর যশোর জেলাকে ১০৩টি পরগণায় বিভক্ত করে এবং এর মধ্যে ৫৩টি পরগণা বর্তমান যশোরের মধ্যে ছিল। [২১]ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ব্রিটিশরা শাসনভার গ্রহণ করে এদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপক পরিবর্তন করে। পূর্বে পঞ্চায়েত গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সরকার কর্তৃক আরোপিত কর সংগ্রহ করতো। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ করলে সমাজে এক নতুন শ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি হয়। [২২]এসব জমিদার স্থানীয় বিষয়াদি পরিচালনাসহ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করতো। [২৩]অপরদিকে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়। জমিদাররা শুধু কর আদায়ের দায়িত্বই লাভ করে নাই, স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাও তাদের হস্তগত হয়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি আইন পাসের মাধ্যমে ভারত শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করলে কোম্পানির ক্ষমতা লোপ পায়। এ সময় ব্রিটিশ সরকার গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ঘোষণার মধ্য দিয়ে অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্থানীয় উন্নয়নের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর কিছু ক্ষমতা অর্পন করা আবশ্যক। [২৪]এ ধারাবাহিকতায় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেয়র তাঁর অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। [২৫]বস্তুত এ প্রস্তাব অনুমোদনের মধ্য দিয়ে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার ভাবমূর্তি অনেকটা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন পাশ হয়; যা ছিল বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ। এ আইনের ধারা মোতাবেক গ্রাম এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়। জেলা প্রশাসক এ পঞ্চায়েতের সদস্যদের মনোনয়ন দিতেন। পঞ্চায়েতের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ছিল সাত জন এবং সর্বোনিম্ন সদস্য ছিল তিন জন। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতেন। [২৬]পঞ্চায়েত গ্রাম চৌকিদারদের সহযোগিতায় এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি কর আদায়ের কাজ করতো। চৌকিদারদের বেতন ভাতার জন্য চৌকিদারী কর নামে এক প্রকার কর জনগণের উপর আরোপ করা হয়। পঞ্চায়েত চৌকিদারদের নিয়োগ ও গ্রাম অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করতো। এ কারণে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের গ্রাম চৌকিদারী আইনকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি বলা হয়। [২৭]এ চৌকিদার আইন প্রতিষ্ঠার ফলে গ্রাম তথা তৃণমূল পর্যায়ে একটা স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো তৈরী হয় সত্য। তবে কোন এলাকার উন্নয়নের জন্য তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ

সৃহীত হয়নি। পঞ্চায়েতের সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। ফলে, তারা জনগণের জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে যে কোন ব্যক্তিকে সদস্যপদ গ্রহণে বাধ্য করতে পারতেন। তবে কোন ব্যক্তি সদস্যপদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ব্যবস্থা ছিল।[২৮]চৌকিদার পঞ্চায়েতের সদস্য কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতো। কিন্তু চৌকিদারকে অপসারণের ক্ষমতা পঞ্চায়েতের ছিল না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ দায়িত্ব পালন করতেন।[২৯]নিজস্ব কর্মচারীর উপর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। ধনী ব্যক্তিগণই যেহেতু পঞ্চায়েতের সদস্য হতো; সেকারণে তারা ইচ্ছামত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর করারোপ করতো; যদিও এ প্রক্রিয়ায় ধার্যকৃত করের হার ছিল খুবই সামান্য। এটাই ছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি। তাছাড়া, এ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়নি। এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক সুবিধা আদায় করা। পঞ্চায়েতের সদস্যগণ জনগণের কল্যাণের প্রতি তেমন কোনও নজর দেয়নি। ফলে, বহুবিধ কারণে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

[৩০]লর্ড রিপণ ভারতবর্ষে আসার পর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মে একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাবনা ঘোষণা করেন। এ প্রস্তাবনায় তিনি গ্রাম এলাকায় জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ইউনিয়ন কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। তাঁর মতে এ ইউনিয়ন কমিটির কাজ হবে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট তৈরী ও মেরামত, পুকুর সংস্কার ও খনন, কবর স্থান, শশ্মানঘাট ও অন্যান্য জনহিতকর কাজের সুপারিশ করা। এ প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে নতুন আইন গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়। এ বিষয় তদারকি করার জন্য তৎকালীন হাওড়া জেলা প্রশাসক ই.কে. ওয়েষ্টম্যানকে অফিসার নিয়োগ করা হয়। গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা, হলে কি অবস্থায় তা করা সম্ভব এবং বাস্তবায়িত হলে তা জনগণের কতটুকু কল্যাণে আসবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করার জন্য ই.কে. ওয়েষ্টম্যানকে এ বলে নির্দেশ দেয়া হয় যে তিনি যেন দ্রুত এর উপর একটি প্রতিবেদন তৈরী করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। এ উদ্দেশ্যে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় পরীক্ষামূলকভাবে ১৮০টি ইউনিয়নে কমিটি গঠন করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জনগণ এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় কতটা আগ্রহশীল ও সহযোগিতা করতে পারবে এবং সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে সক্ষম হবে কিনা তা নিয়ে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করা। তাই পরীক্ষামূলকভাবে এ ইউনিয়ন কমিটিগুলোতে ভোট অনুষ্ঠিত হলে জনগণের পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। কার্যত মি.ই.কে. ওয়েষ্টম্যানকৃত সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এক প্রস্তাবনার মাধ্যমে ইউনিয়ন কমিটির বিষয় গ্রহণ করেন। তবে দুই-একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (লে. জেনারেল) বিরোধিতার কারণে আইনটি পাশ হতে বিলম্ব হয়। অত:পর ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিলটি পুনরায় উত্থাপিত হলে ৬ এপ্রিল

বঙ্গীয় আইন পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে পাশ হয়। [৩১]এ আইন ছিল ভাইসরয় লর্ড রিপণের সুপারিশের ফল। রিপণের শাসনামলের সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্কার।

[৩২]এ আইনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলার জনসাধারণকে তাদেরও স্থানীয় বিষয়াদি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা এবং দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। [৩৩]এ আইন প্রণীত হবার পর তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে। প্রতিটি জেলায় জেলাবোর্ড, প্রতি মহকুমায় লোকাল বোর্ড এবং প্রতি ইউনিয়নে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ইউনিয়ন কমিটির সদস্যগণ মনোনীত ছিলেন না। তাঁরা ইউনিয়নের প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। তবে সদস্যসংখ্যা ৫জনের কম বা ৯জনের বেশি হতো না। [৩৪]এ আইনের মাধ্যমে লর্ড রিপণের ইচ্ছার প্রতিফলিত ঘটেছে বলে তাঁকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

[৩৫]ব্রিটিশ শাসনামলে জেলা ছিল মূল প্রশাসনিক একক। জেলা সৃষ্টির পর থেকে প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হওয়ার পর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর জেলা কমিটিকে জেলা বোর্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রতিটি মহকুমায় মনোনীত সদস্যদের নিয়ে একটি লোকাল বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা ছিল। জেলা বোর্ডের সভাপতিত্ব করতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি লোকাল বোর্ড নিয়ন্ত্রণ ও দেখাশুনা করতেন। জেলা বোর্ড গঠিত হতো মনোনীত সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী এবং লোকাল বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা। জেলা বোর্ডের নির্বাচন পরোক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হতো। ১৮৮৬-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লোকাল বোর্ড ইলেক্টোরাল কলেজ হিসেবে কাজ করে। জেলা বোর্ডের ৬০% সদস্য লোকাল বোর্ডের সদস্য হতো। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে লোকাল বোর্ড বিলুপ্ত করা হয়। অত:পর জেলা বোর্ডের ২/৩ অংশ সদস্য নির্বাচিত এবং ১/৩ অংশ সদস্য মনোনীত হতো। বিভাগীয় কমিশনার এ মনোনয়ন দান করতেন। মনোনীত সদস্য ছিল দুই ধরনের যথা- সরকারি ও বেসরকারি। তবে মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা পঞ্চাশ ভাগের বেশি ছিল না। [৩৬]জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ ২৫ জন সদস্য নিয়ে জেলা বোর্ড গঠিত হতো। এর মধ্য থেকে ৬জন সরকার কর্তৃক মনোনীত, ১২জন নির্বাচিত এবং পদাধিকারবলে ছিলেন ৭জন সদস্য। [৩৭]১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলা বোর্ডে নির্বাচিত সদস্যরা হলেন- যশোর সদর লোকাল বোর্ডের রাজা গয়ানন্দ কান্তি রায়, বাবু নবকুমার চৌধুরী, বাবু সতীশবার বোস, ঝিনাইদহ লোকাল বোর্ডের বাবু কালিনাথ মুখার্জী, বাবু বাদিকা চরণ দত্ত, মাগুরা লোকাল বোর্ডের বাবু বসন্ত কুমার বোস ও ভবানন্দ চক্রবর্তী, নড়াইল লোকাল বোর্ডের বাবু বঙ্গসী ধর সেন, বনগাঁ লোকাল বোর্ডের বাবু মন্মত কুমার বোস, গয়ানন্দ বোস, সুশীলেন্দ্র মুখার্জী। এছাড়া যে সকল সরকারি কর্মকর্তা জেলা বোর্ডে ছিলেন তারা হলেন- ডেপুটি কালেক্টর নড়াইল মহকুমা কর্মকর্তা, ঝিনাইদহ মহকুমা কর্মকর্তা, মাগুরা মহকুমা কর্মকর্তা, সিভিল মেডিকেল অফিসার, ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর

প্রমুখ।

[৩৮]১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য জেলাকে মহকুমায় বিভক্ত করার এক পরিকল্পনা সৃহীত হয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলাকে পর্যায়ক্রমে মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। উইলিয়াম বেন্টিং-এর সময় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করে মহকুমা প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়ে সেখানে প্রেরণ করা হয়। [৩৯]উল্লেখ্য, ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে খুলনাকে মহকুমা করা হয়। এসময় যশোর সদর ও নড়াইলের কিছু অংশ খুলনা মহকুমার শাসনাধীন ছিল। [৪০]অত:পর ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মাগুরা মহকুমা, ১৮৬২ সালে ঝিনাইদহ মহকুমা, ১৮৬০-৬১ সালে নড়াইল মহকুমা এবং ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাগেরহাটকে মহকুমা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। [৪১]১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে যশোরের মধ্য হতে খুলনা ও বাগেরহাট মহকুমা এবং ২৪ পরগণার মধ্য হতে সাতক্ষীরা মহকুমা নিয়ে খুলনাকে একটি নতুন জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। [৪২]এভাবে যশোর জেলার সদর মহকুমার সাথে নড়াইল, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও বনগাঁসহ পাঁচটি মহকুমা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের স্বায়ত্তশাসন আইনে মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড গঠন করা হয়। এ লোকাল বোর্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো এবং আরও বলা হয় যে, সর্বনিম্ন ৬জন সদস্যের কমে এ বোর্ড গঠিত হবে না। অনেক ক্ষেত্রে এর সদস্য সংখ্যা ৯-৩০জনের মধ্যে ছিল। এর দুই-তৃতীয়াংশ জনগণের সীমিত ভোটে নির্বাচিত হতো। বাকিটা সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হতো। মহকুমার অন্তর্গত প্রতিটি থানা থেকে একজন করে লোকাল বোর্ডের সদস্য রাখার বিধান রাখা হয়। সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। উল্লেখ্য, এলাকায় বসবাসকারী যে কোন পুরুষ নাগরিক যিনি বার্ষিক ৫/- টাকা কর দিতে সক্ষম তিনি লোকাল বোর্ডের সদস্য হওয়ার জন্য নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। এর জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এর সমীপে প্রতিনিধিত্বকারীর ৫০/- জমা দিতে হতো। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা জমা না দিলে নির্বাচন কমিশনার মনোনয়ন পত্র বাতিল বলে ঘোষণা করতো। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের কোন সদস্য অপসারণ কিংবা অন্য কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত। লোকাল বোর্ডের কার্যকালের মেয়াদ ছিল ৪ বছর। লোকাল বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান থাকত যিনি সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন এবং মাসিক সভায় সভাপতিত্ব করতেন। বস্তুত লোকাল বোর্ডের মূল কাজ ছিল নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। অধিকন্তু, কোন বিষয় ইউনিয়ন কমিটিতে অমীমাংসিত থাকলে তা মীমাংসার জন্য লোকাল বোর্ডে প্রেরণ করা হতো। এছাড়া রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা, পাহারার ব্যবস্থা, জল নিষ্কাষণ, কবরস্থান ও শশ্মানঘাট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনের মধ্য দিয়েই লোকাল বোর্ড তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকত।

লোকাল সেলভ গভর্ণমেন্ট অ্যাক্ট ৩ এর অধীনে লেকাল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় যশোর জেলা বোর্ডের অধীনে যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল এবং বনগাঁ লোকাল

বোর্ড ছিল। যশোর লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮জন; এদের মধ্যে ৫জন নির্বাচিত এবং ১৩জন সরকার কর্তৃক মনোনীত। ঝিনাইদহ লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৯জন; এদের মধ্যে ২জন নির্বাচিত, ৭জন সরকার কর্তৃক মনোনীত। মাগুরা লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৯জন; এদের মধ্যে ৪জন নির্বাচিত, ৫জন সরকার কর্তৃক মনোনীত। নড়াইল লোকাল বোর্ডের ৯জন সদস্যের মধ্যে ৩জন নির্বাচিত এবং ৬জন সরকার কর্তৃক মনোনীত। বনগাঁ লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১২জন; এদের সকলেই ছিলেন সরকার কর্তৃক মনোনীত।

[৪৩]১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলার লোকাল বোর্ডগুলোর [৪৪]নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে সদর লোকাল বোর্ড থেকে ১২জন, নড়াইল লোকাল বোর্ড থেকে ৬জন, মাগুরা লোকাল বোর্ড থেকে ৬জন এবং বনগাঁ [৪৫]লোকাল বোর্ড থেকে ১০ জনসহ মোট ৪০জন সদস্য নির্বাচিত হয়। এর মধ্যে একজন মাত্র মুসলামান সদস্য ছিলেন। আর বাকি ঊনচল্লিশ জন সদস্য ছিলেন হিন্দু। এছাড়া বিভিন্ন লোকাল বোর্ডে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যরা হলেন- সদর লোকাল বোর্ডের রাজা গয়ানন্দ, কান্তরায়, যদুনাথ মজুমদার, উমেশচন্দ্র ঘোষ, ধরণীধর হালদার, আর. এইচ. ট্রিগলিম, সৈয়দ আহম্মদ; নড়াইল লোকাল বোর্ডের যগেন্দ্রনাথ সেন, বিপিণ বিহারী বোস, কিরণচন্দ্র রায়, ঝিনাইদহ লোকাল বোর্ডের মি. চার্লস টুইডি, হরনাথ চ্যাটার্জী, রামরতন ঘোষ চৌধুরী; মাগুরা লোকাল বোর্ডের মি. জে.এইচ. ও টম, মৌলবী আফসার উদ্দীন খান চৌধুরী, তারেক চন্দ্র সেন; বনগাঁ লোকাল বোর্ডের গয়ানন্দ সরকার বোস, কামকানাথ আচার্য, সুরানাথ চৌধুরী, হরিশচন্দ্র রায় ও বামাচরণ বোস। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে সকল থানায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বা সাব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নির্বাচন পরিচালনা করতো। [৪৬]সরকার লোকাল বোর্ডের জন্য ভিন্ন ভিন্ন থানা থেকে ৪০জন সদস্য মনোনীত করতো। এ সকল মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জমিদার, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শক, নীল ব্যবসায়ী, ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। বলাই বাহুল্য, সরকারের মনোনীত সদস্যদের মধ্যে একজন মুসলমান ছিলেন। এছাড়া লে. গর্ভনরের নির্দেশে আরও ২০জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ২০জন সদস্যের মধ্যে সদর লোকাল বোর্ডে ৬জন, নড়াইল লোকাল বোর্ডে ৩জন, মাগুরা লোকাল বোর্ডে ৩জন এবং বনগাঁ লোকাল বোর্ডে ছিলেন ৫জন সদস্য।

[৪৭]১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলার লোকাল বোর্ডের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে সদর লোকাল বোর্ডের বিভিন্ন থানা থেকে যারা নির্বাচিত হন তারা হলেন- কতোওয়ালী থানার বাবু নবকুমার মুখার্জী, মুনশী তোফেল উদ্দীন খন্দকার, চৌগাছা থানার বি. নাথ ঘোষ, কেশবপুর থানার কর্তিক চন্দ্র ঘোষ, শশীনাথ বিশ্বাস, মনিরামপুরের গোপাল চন্দ্র কর, নওপাড়ার যদুনাথ চক্রবর্তী, বাঘারপাড়ার হরিদে নাথ দত্ত, গদখালীর মহেন্দ্রনাথ সেন, বামানাথ দত্ত; বনগাঁ লোকাল বোর্ডের সদর থানার গঙ্গাচরণ চ্যাটার্জী, জগবন্ধু চ্যাটার্জী, মহেশপুরের বিহারী লাল মুখার্জী বিশ্বেস্বর ভট্টাচার্য, গড়পোতার মহেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী,

কাজী নূরুল হক, শার্শার মানিক চন্দ্র মিশ্রী, মহেন্দ্র নাথ রায়, গয়ঘাটার শুশীলেন্দ্র মুখার্জী, ফটিক চন্দ্র চৌধুরী, মাগুরা লোকাল বোর্ডের মহম্মদপুর থানার কেদার নাথ ঘোষ, কাজী গহর আলী, শালিখার দূর্গাপ্রসন্ন দাস, মাগুরা সদর থানার নিপেন্দ্র নাথ পাল, কৈলাশ চন্দ্র দত্ত, অম্বিকাচরন সরকার; নড়াইল লোকাল বোর্ডের সদর থানার বসন্তলাল দত্ত, কমল কৃষ্ণ দত্ত, গঙ্গা কুমার মিত্র, যগেশ্বর ভট্টাচার্য, কালিয়ার বাবু বংশধর সেন; ঝিনাইদহ লোকাল বোর্ডের শৈলকুপা থানার কেদার নাথ, গতিনাথ মৈত্র, ঝিনাইদহ সদর থানার মহেন্দ্র নাথ সেন, কেশব চন্দ্র চ্যাটার্জী, হরিণাকুণ্ডুর পূর্ণচন্দ্র মল্লিক, কোটচাঁদপুরের প্রীয়নাথ মুখার্জী। তবে কালীগঞ্জ ও লোহাগড়া থানার নির্বাচন অনেক পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য ছাড়াও লোকাল বোর্ডগুলোতে সরকার আরও চল্লিশজন সদস্য মনোনীত করে। এসকল সদস্য স্থানীয় জমিদার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার ছিলেন। এছাড়া ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের স্বায়ত্তশাসন আইনের তৃতীয় ধারা বলে লে. গভর্ণর জেনারেল সদর লোকাল বোর্ডে ৬ জন, বনগাঁয় ৫জন, মাগুরায় ৩জন, নড়াইলে ৩জন এবং ঝিনাইদহে ৩জন সদস্য মনোনীত করেন।

[৪৮]১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সদর লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে যশোর সদর থেকে ১২জন সদস্য নির্বাচিত ও ৬জন মনোনীত, ঝিনাইদহ থেকে ৬জন নির্বাচিত ও ৩জন মনোনীত, মাগুরা থেকে ৬জন নির্বাচিত ও ৩জন মনোনীত, নড়াইল থেকে ৬জন নির্বাচিত ও ৩জন মনোনীত এবং বনগাঁ থেকে ১০জন নির্বাচিত ও ৫জন মনোনীত মোট ৬০জন সদস্য ছিল। এর মধ্যে ২০জন সরকার কর্তৃক মনোনীত, আর বাকি ৪০জন নির্বাচিত। উল্লেখ্য, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্বায়ত্তশাসন আইনের ৯ নম্বর সেকশনে বলা হয় যে, প্রত্যেক লোকাল বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হবে। [৪৯]এসময় যশোর জেলার রাজস্ব কালেক্টর ই.ডব্লিউ মেলোনী যশোর পৌর কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান হন এবং জর্জ কর্কবার্ণ, টি.টি.এলেন, জে.সি.শ, রাজা বরদাকান্ত, রায় বাহাদুর বাবু আনন্দমোহন মজুমদার, বাবু মদনমোহন মজুমদার ও মৌলভী পায়রাতুল্লাহ কমিশনার নিযুক্ত হন। যশোর মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বেসরকারি সভাপতি হন প্যারী মোহন গুহ এবং একই প্রক্রিয়ায় সহসভাপতি হন উমেশ চন্দ্র ঘোষ।

মহকুমার পরের প্রশাসনিক স্তর হিসেবে থানা বিবেচিত হতো। অনেকে থানাকে পুলিশ [৫০]এবং রাজস্ব [৫১]একক হিসেবে অভিহিত করেছেন। বস্তুত থানা সৃষ্টি করা হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য। থানা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের কোন স্তর ছিল না। কিন্তু মহকুমার নিম্নে প্রশাসনের এক স্তর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্থানীয় সরকারগুলো সুগঠনের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিশন গঠন করেন। এ কমিটি Royal Commission নামে পরিচিত। এ কমিশন প্রশাসনের সুবিধার্থে মহকুমার সংখ্যা বৃদ্ধি করা অথবা এসব মহকুমাকে সার্কেলে বিভক্ত করার সুপারিশ করেন। কারণ মহকুমার প্রশাসনের দ্বারা এত বড় এলাকার শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। এ সুপারিশ ও নানাবিধ অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে লোকাল বোর্ড বা

মহকুমাকে একাধিক সার্কেলে বিভক্ত করা হয়। মহকুমার নিম্ন স্তর হলো সার্কেল। প্রতিটি সার্কেলের জন্য একজন করে সার্কেল অফিসার বা সি.ও. (Circle Officer) থাকবেন। প্রথম দিকে ২/৩টি থানা নিয়ে একটি সার্কেল গঠন করা হয়।[৫২]সার্কেল বোর্ডের ১৫ জন সদস্যের মধ্য থেকে ২/৩ অংশ ইউনিয়ন পঞ্চায়েত সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং বাকি ১/৩ অংশ কমিশনার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। সার্কেল বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল লোকাল বোর্ডের পক্ষে ইউনিয়ন কমিটিকে নিয়ন্ত্রণ করা। তাছাড়া, সার্কেল বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজ করতো।

[৫৩]১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের আইন অনুসারে শুধুমাত্র সিলেট বাদে প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা বোর্ড গঠিত হয়। কিন্তু এসময় সিলেটে লোকাল বোর্ড ছিল। জেলা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতো এবং সদস্য সংখ্যা ছিল ৯জন। এ সকল সদস্য মনোনীত, আংশিক মনোনীত বা নির্বাচিত হতো। যে সকল জেলায় কোন লোকাল বোর্ড ছিল না সেসব জেলা বোর্ডের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো। পক্ষান্তরে, যেখানে লোকাল বোর্ড ছিল সেখানে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হতো লোকাল বোর্ডের সদস্যদের দ্বারা। অর্থাৎ জেলা বোর্ডের সদস্য ছিল দুই ধরনের- সরকারি ও বেসরকারি।[৫৪]সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।[৫৫]কোন সদস্য মৃত্যু বা অপসারিত হলে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো। প্রত্যেক জেলা বোর্ডে একাধিক ভাইস-চেয়ারম্যান থাকতেন। লোকাল বোর্ডের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কিছু স্থায়ী কর্মচারী ছিল তারা জেলা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হতো। এছাড়া একজন সেক্রেটারী ও একজন হিসাব রক্ষক থাকত। জেলা বোর্ডের কাজ ছিল বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ, ইউনিয়ন কমিটি, সার্কেল ও লোকাল বোর্ডে অমীমাংসিত বিষয়াদি নিষ্পত্তি করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারী মোকাবেলা এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি।

[৫৬]পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি হচ্ছে শহর এলাকার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক কাঠামো। বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনিক স্তর হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এবং শহর এলাকার জন্য পৌরসভা বিদ্যমান রয়েছে। ব্রিটিশরা এদেশে প্রথমে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে প্রথম পৌর কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশন-এর বারজন আল্ডারম্যান ভোট দিয়ে মেয়র নির্বাচন করতো। ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির উদ্যোগে কলকাতা ও বোম্বাই শহরে পৌরকর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে পৌর প্রতিষ্ঠার একটি আইন প্রণীত হয়। অত:পর ১৮৫০ সালে ভারতের সর্বত্র পৌরসভা প্রতিষ্ঠার আইন পাশ হয়। পৌরসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হতো এবং এক-তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো। পদাধিকারবলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পৌরসভার চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করতেন। তবে ভাইস-চেয়ারম্যান ভোটের মাধ্যমে নিযুক্ত হতেন।[৫৭]পৌরসভার কাজ পৌর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আওতাধীন বিষয়াদি দেখাশুনা করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে

পৌরসভার রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা, পার্ক-উদ্যান তৈরী করা, বিনোদনের ব্যবস্থা করা, পৌর এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা পৌরসভার কাজের আওতাভুক্ত ছিল।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভা উৎকর্ষ আইন প্রণীত হয়। এ আইনে বলা হয় যে, প্রতিটি বড় বড় শহরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত করা হবে। আইনের তৃতীয় ধারা অনুযায়ী একই বছরে যশোর মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা গঠিত হয়। এ পৌরসভা ১০টি মৌজায় বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো- যশোর, পুরাতন কসবা, ঘোপ, রেন্দি নীলগঞ্জ মুরলী, বেজপাড়া, শংকরপাড়া, চাচড়া ও খড়কী এবং সীমানা নির্ধারিত হয় সাড়ে চার মাইল। [৫৮]পৌরসভা পরিচালনার জন্য ১৮জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির মধ্যে ১২জন সদস্য নির্বাচিত এবং ৬জন সরকার কর্তৃক মনোনীত করার কথা বলা হয়। [৫৯]১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের পৌরসভা আইনের সূত্র ধরে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে কিছু প্রভাবশালী হিন্দু জমিদারদের প্রচেষ্টায় মহেশপুর পৌরসভা প্রতিষ্টিত হয়। এ পৌরসভা পরিচালনার জন্য ১৫জন কমিশনার নিয়ে একটি পৌরসভা বোর্ড গঠন করা হয়। এর মধ্যে ১০জন নির্বাচিত, ৪জন সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ১জন পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান ছিলেন। পৌরসভার সীমানা নির্ধারণ করা হয় ৩ বর্গমাইল। [৬০]অত:পর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কোটচাঁদপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০জন সদস্য নিয়ে এ পৌরসভার বোর্ড গঠন করা হয়। এর মধ্য থেকে ৬জন নির্বাচিত, বাকি ৪জন সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো এবং সীমানা নির্ধারণ করা হয় ৪ বর্গমাইল।

[৬১]১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হয়। এ আইন মালদহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল ব্যতীত প্রদেশের সর্বত্র কার্যকর ছিল। [৬২]গ্রাম স্বায়ত্তশাসন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দুই স্তর বিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী করা হয়। এগুলো হলো ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড যা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের আইনের অধীনে স্থানীয় সরকারের মূল প্রশাসনিক একক ছিল। ইউনিয়ন বোর্ড গ্রাম অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। [৬৩]ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যাবলী ছিল দুই ধরনের- বাধ্যগত ও ঐচ্ছিক। চৌকিদার ও দফাদারদের সহায়তায় ইউনিয়নের শান্তি-শৃংখলা বিধান করা ছিল বাধ্যতামূলক এবং জনহিতকর কার্যসাধন ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউনিয়ন বোর্ড সর্বোচ্চ ১০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো। দশ হাজার জনগণ এবং ১০/১৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে এ ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়। [৬৪]সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ৬জন এবং উর্ধ্বে ৯জন হবে। [৬৫]১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করার পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ৯জন; এর মধ্যে ৩জনকে মনোনয়ন দিতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর বাকি ৬জন নির্বাচিত হতেন। সার্কেল অফিসার মনোনয়ন দেয়ার জন্য এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নামের তালিকা তৈরী করতেন। অত:পর এই তালিকা মহকুমা প্রশাসকের দ্বারা পরীক্ষিত ও চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দেয়ার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করতেন। হিন্দু-মুসলমান সমপ্রদায়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ২জন সদস্য মনোনয়ন দিতেন। যেখানে নির্বাচিত মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল সেখানে

২জন হিন্দু মনোনয়ন দিতেন। আবার যেখানে নির্বাচিত হিন্দুদের সংখ্যা বেশি ছিল সেখানে ২জন মুসলমান সদস্য মনোনয়ন দিতেন। [৬৬]বাস্তবে স্থানীয় শাসন কাঠামোতে মুসলমানদের উপস্থিত ছিল কম। উল্লেখ্য, যশোর জেলায় ৫টি ইউনিয়ন কমিটি ছিল। এর মধ্যে কালিয়া এবং কেশবপুর ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে হরিনাকুণ্ডু এবং ১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে ঝিনাইদহ ইউনিয়ন কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া গোড়াপোতা ইউনিয়ন কমিটি হিসেবে কাজ করতো যা পরর্বর্তীতে বিলুপ্ত হয়। ইউনিয়ন কমিটির কাজ ছিল রাস্তাঘাট সংরক্ষণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর তদারকী এবং গ্রামের পয়:নিষ্কাশন দেখভাল করা।

[৬৭]উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, যশোর বাংলাদেশের প্রাচীন জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ জেলায় মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন ও মুললিম শাসনামলে যে শাসন কাঠামো গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে রাজস্ব আদায়সহ প্রশাসনিক সুবিধার্ধে সমগ্র যশোর জেলাকে পরগণায় বিভক্ত করা হয়েছিল, যা ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথমদিকেও আংশিকভাবে কার্যকর ছিল। কিন্তু ব্রিটিশের গৃহীত স্থিতিশীল রাজনৈতিক প্রশাসনিক নীতি যশোর জেলায় প্রচলিত শাসন কাঠামো ভেঙ্গে নিজেদের মত করে গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিকাশের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। তারা বাস্তবতা বিবর্জিত এক ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো উপহার দেন। তাছাড়া ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে যে স্তর সৃষ্টি করা হয়েছিল তার মধ্যে কোন স্ব-শাসনের অস্তিত্ব না থাকায় যশোর জেলার জনপ্রতিনিধিদের সাথে মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থায় যশোর জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, পৌরকমিটি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। ফলে জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। প্রকৃত অর্থে যশোর জেলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার তেমন বিকাশ হয়নি। প্রশাসনের নিম্নস্তর জেলা, মহকুমা, থানা বা ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হলেও ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক মানসিকতার কারণে সর্বজনীন স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। যশোর জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে যে সকল জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করতেন তাদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। কারণ ব্রিটিশ সরকারের ভেদ নীতির কারণে যশোর জেলার মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষায় হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। ফলে জেলার সাধারণ মানুষ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। তথাপিও ব্রিটিশদের গৃহীত পদক্ষেপ আজকের যশোর জেলা তথা বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের স্তরগুলো প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ করেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার ভিত শক্তিশালী করতে হলে জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করতে হবে। কাজেই যশোর জেলা তথা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল সেটিকে সংযোজন-বিয়োজন করে আধুনিক প্রশাসনিক নীতি গ্রহণ করলে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সুফল বয়ে আনবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. ড. মো. মকসুদুর রহমান, বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮), পৃ.৫ ।

২. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রমাণিক, ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি (কলকাতাঃ শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৩), পৃ. ৬৯০; কামাল সিদ্দিকী(সম্পা.), বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার (ঢাকাঃ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ১৯৮৯), পৃ.৩ ।

৩. The Imperial Gazetteer of India, Vol. IV (London: Clarendon Pess, 1909), pp. 282-283.

৪. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ.৭৪ ।

৫. Nani Gopal Majumdar, Inscription of Bengal, Volume III (Rajshahi: Varendra Research Soceity, 1929), p. 121 (Henceforth IB)

৬. Ibid, P. 127.

৭. IB, Volume III, pp. 170, 192-193.

৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য Abul Fadl, Ain-i-Akbari, Vol. II, trans. H.S. Jerret (Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1949), pp. 43-44 (Henceforth AA].

৯. I.H. Qureshi, Administration of the Mughal Empire (Karachi: University of Karachi, 1966), p. 227.

১০. Sir Jadunath Sarker, Adminsitration of the Mughal (Calcutta: Sarker and Sons Ltd. 1952), p. 10.

১১. S.A.Q. Husani, Administration under the Mughal (Dacca: Paradise Library, 1952), p. 234.

১২. Ibid, p. 234.

১৩. Ibid.

১৪. Sree Ram Sharma, The Structure of the Mughal Empire (Bombay: Hindu Kitabs Limited, 1951), p. 20.

১৫. AA, vol. II, p. 141.

১৬. H. Blockman, "Contribution to the Geography and History of

Bengal, JASB, Part. III, Calcutta, 1873, pp. 215-216.

১৭. AA, vol, II, pp. 141-146.

১৮. A.B.M. Hussain, "Bara Bazar: Was it the Mohumadabad of Sultani Bangal". Essays in Memory of Momtazur Rahman Trafdar (Dhaka: Dhaka University, 1999), p. 235.

১৯. AA, Vol. II, pp. 144-146.

২০. সাদ আহম্মদ, "বারো বাজারের ইতিহাস ও ঐতিহ্য", অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০) পৃ. ৩৮-৩৯।

২১. W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol. II (New Delhi: D.K. Publishing House, 1973), pp. 320-328.

২২. Cf. Tarachand, History of Freedom Movement in India (New Delhi: Ministry of Information, 1961).

২৩. Md. Moksudur Rahman, ÒEvolution of the Union Parishad as a Self- Government in BangladeshÓ, JIBS, Vol. VII, Rajshahi, 1984, p.24.

২৪. Ibid.

২৫. ড. মো: মকসুদুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।

২৬. তদেব।

২৭. Rokeya Rahman Kabeer, Administrative Policy of the Government of Bangal: 1870-1890 (Dacca: NIPA, 1965), p. 8.

২৮. ড. মো: মকসুদুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

২৯. The Village Chowkidary Act 1870, Section XL.

৩০. JIBS, Vol. VII, p. 26.

৩১. Ibid. pp. 26-27.

৩২. Hugh Tinker, The foundaton local-self government in India,Pakstan and Burma (London, 1924), p. 43.

৩৩. Report on the Administrarion of Bengal, 1885-86 (Calcutta, 1887), p. 80.

৩৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১০), পৃ. ৩৮৭।

৩৫. Najmul Abedin, Local Administration and Politics in Modernizing Societies- Bangladesh and Pakistan (Dacca: NIPA, 1973), P. 42.

৩৬. K.G.M. Latiful Bari, Bangladesh District Gazeteers: Jessore (Dacca: Bangladesh Government Press, 1979), p. 283.

৩৭. L.S.S. O'Malley, Bengal District Gazeteers, Jessore (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1912), p. 131.

৩৮. Printed Proceedings A (Local Self-Governemt) (Dhaka: NAB, Bundle No.7, 1893), p. 2.

৩৯. ড. মকসুদুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪ ।

৪০. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড (কলিকাতাঃ চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এ্যান্ড কোং, ১৩২১ বাংলা), পৃ. ৬৯৪ ।

৪১. W.W. Hunter, op.cit. pp. 317-319.

৪২. সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৫-৬৯৬ ।

৪৩. L.S.S. O'Malley, op.cit., p. 132.

৪৪. এ লোকাল বোর্ডগুলো হলো- যশোর সদর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও বনগাঁ ।

৪৫. বনগাঁ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল । কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পশ্চিম বাংলার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় ।

বর্তমান যশোর জেলার শার্শা ও মহেশপুর থানা বনগাঁর অধীনে ছিল । সে কারণে আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রে বনগাঁ স্থান পেয়েছে ।

৪৬. Printed Proceedings A (Local Self-Government) (Dhaka: NAB, Bundle no.5, 1889-90), p.1.

৪৭. Ibid., pp. 3-4.

৪৮. Printed Proceedings A (Local Self-Government) (Dhaka: NAB, Bundle no. 7, 1892), pp. 1-3.

৪৯. Printed Proceedings A (Local Self-Government) (Dhaka: NAB, Bundle no. 12, Nos. 3-5, 1913), p.1.

৫০. W.W. Hunter, Statistical Accounts of Bengal, District of Murshidabad and Pabna (Delhi: D.K. Publishing House, Reprint 1974), p. 356.

৫১. L.S.S.O'Malley, Bengal District Gazetteers, Rajshahi (Calcutta:

Bengal Secretariat Press, 1916), p. 129.

৫২. ড. মো. মকসুদূর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭।

৫৩. তদেব।

৫৪. Government of Bengal, Bengal Self-Government Act III of 1885 (Calcutta: Bengal Secretariat Book Deport, 1933), Section 7.

৫৫. Ibid, Section 10A.

৫৬. ড. মো. মহসুদূর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২।

৫৭. তদেব, পৃ. ৬৪-৬৫।

৫৮. K.G.M. Latiful Bari, op. cit., p. 289.

৫৯. Ibid., p. 133.

৬০. Ibid., p. 134.

৬১. L.S.S. O'Malley, op.cit., p. 134.

৬২. Government of Bengal, Administration of Bengal under the Earl of Ronaldshay, 1917-1922 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1922), p. 69.

৬৩. JIBS, vol. VII, p. 33.

৬৪. Ibid,

৬৫.Bengal Village Self- Government Act. V, 1919 (Alipore: Bengal Government Press, 1937), Section 6 (1).

৬৬. JIBS, Vol. VII, p. 36.

৬৭. L.S.S. O'Malley, op.cit, p. 1

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলিটদের উন্নয়ন ভূমিকা: বগুড়া জেলার দু'টি ইউনিয়নের একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষা

ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ্

Abstract: *The rural Elites of South Asia perform some common economic activities including Bangladesh. The classical economic role of rural Elites of Bangladesh is, nowadays, significantly widened in diversified areas of economic activities to cope up themselves with the social and technological progresses. This evolution in the performances of the rural Elites helps Bangladesh to grow up as a prosperous nation. This paper would show readers the catalystic roles of the rural Elites in adopting modern agricultural technologies, in widening employment opportunities, in poverty alleviation, in disbursement of credit, in gaining Bank and other institutional loan and administrative facilities, in bringing rural people under the structure of cooperatives what were not explored before.*

ভূমিকা

উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। আর এ প্রক্রিয়াকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সরকার ও জনগণকে যুগপৎ কাজ করতে হয়। উন্নয়নের মূল শর্তই হলো প্রাগ্রসর ভূমিকা। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি কসমেটিক উন্নয়নের যে ধারা বিদ্যমান তা সব সময় সম্পাদিত হয়েছে অস্থায়ী (ad-hoc) ভিত্তিতে। রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরের ভিড়ে উন্নয়নের অংশগ্রহণমূলক ধারা এখনো ন্যূনতম অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। এর পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান সরকারি কাঠামো, যেমন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে এখনো নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উগ্র প্রতিযোগিতার কারণে আজ পর্যন্ত কোনো সরকার গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি টেকসই কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টাও করেনি। তার ওপর যে সকল কাঠামো রয়ে গেছে তার কার্যবিধি, দায়িত্ব পরিধি সম্পর্কে গণমানুষের মাঝে কোনো স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেনি। একটি বিষয় স্পষ্ট যে, গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে যথাযথ নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। মূলতঃ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার বাইরে রেখে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থানকারী গ্রামীণ এলিটেরা যথার্থ নেতৃত্ব প্রদানের

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টরন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি, রাজশাহী

মাধ্যমে যে কোনো ধরনের কর্মসূচীর উন্নয়ন তৎপরতাকে ত্বরান্বিত করতে পারেন। এ নেতৃত্ব কোনো রকম প্রশিক্ষণ বা সরকারি প্রণোদনায় গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। নেতৃত্ব সৃষ্টি অপেক্ষা গড়ে ওঠা সহজতর। তাই গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করলে সঠিক নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। আর এ ধরনের নেতৃত্বের জন্য স্থানীয় এলাকার গ্রামীণ এলিটেরাই যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। নিজ নিজ এলাকার সমস্যা চিহ্নিতকরণে এবং সমাধানের বহুমুখী কৌশল নির্ধারণে তারাই উপযুক্ত নির্দেশক। গ্রামের যে কোনো ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের (সরকারী) কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য গ্রামীণ এলিটদের সহযোগিতা অপরিহার্য। মূলত: গ্রাম পর্যায়ে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যে কোনো উন্নয়ন প্রচেষ্টার সফল রূপকার গ্রামীণ এলিট শ্রেণী। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় প্রভাবশালী হয়ে উঠতে, ক্ষমতার পরিমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করতে গ্রামীণ উন্নয়ন তৎপরতায় এলিটীয় প্রতিযোগিতার যে চিত্র সাম্প্রতিক প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে তা মূলতঃ সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ উন্নয়নকেই ত্বরান্বিত করে। ফলশ্রুতিতে উন্নয়ন গবেষকদের নিকট গ্রামীণ উন্নয়ন তৎপরতায় স্থানীয় এলিটদের ভূমিকার চিত্রায়ন করা সময়ের দাবি বলে বিবেচিত হচ্ছে ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে-

এক. গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের অংশগ্রহণ (participation) পরীক্ষা করা;

দুই. গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা (role) পরীক্ষা করা;

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটির জন্য মূলতঃ সার্ভে বা জরিপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় পারপাসিভ স্যাম্পলিং বা লক্ষ্যভিত্তিক নমুনায়নের প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার জবাব সংগ্রহ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গ্রামীণ এলিটদের এ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক, গবেষণাকর্ম, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী থেকে তথ্য-উপাত্ত নেয়া হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় এলিট শ্রেণীর ভূমিকাকে চিহ্নিত করার প্রয়াসে বর্তমান গবেষণাকর্মটি বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার দু'টি ইউনিয়নের (বিশালপুর ও মির্জাপুর) নির্বাচিত ২০০জন গ্রামীণ এলিটের সাক্ষাৎকার এবং তাদের অর্থনৈতিক ভূমিকা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে।

ক) এলিট, গ্রামীণ এলিট: সংজ্ঞা ও মতবাদ

সতের শতকে কোনো পণ্যের বিশেষ উৎকর্ষকে বিশেষায়িত করবার জন্য 'এলিট' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে উর্ধ্বস্থ কোনো সামাজিক দলকে বোঝানোর জন্য এ

প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে (Bottomore,1964)। ১৯৩০-৩৫ এ ইতালীয় সমাজতাত্ত্বিক ভিলফ্রেডো প্যারেটোর সমাজতাত্ত্বিক লেখার মধ্যে দিয়ে তা বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে (Pareto,1935)। কোনো সম্প্রদায়ের উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন অধিকতর প্রভাবশালী কোনো দলকে বোঝাতে প্যারেটো এলিট শব্দটি ব্যবহার করেছেন। একটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্যারেটো তাদেরকে এলিট বলে গণ্য করেছেন যারা সরকারের ওপর শক্ত প্রভাব খাটাতে পারেন এবং শাসক এলিট এ বিশেষ দলের লোকজনের সমন্বয়ে গঠিত। আর বাকি লোকজন নিয়ে গঠিত শাসক বহির্ভূত এলিট। Bottomore আরো দেখান যে, এলিটীয় দর্শন মার্কসীয় দর্শনের একটি বিপরীত অবস্থা (Bottomore, 1964:7-49)। ইতিহাসের নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাল মার্কস রাজনীতির চেয়ে অর্থনীতির ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। Mills (1956) তাদেরকে এলিট শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করেন, যারা সমাজের প্রধান প্রধান পদগুলো তাদের অধিকারে রাখেন এবং সে সাথে ক্ষমতা, সম্পদ ও জনপ্রিয়তা ভোগ করেন (Mills, 1956:13)। তিনি আমেরিকান এলিটের একটি সমীক্ষা থেকে তার উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং দেখান যে, 'ক্ষমতা এলিট' (Power Elite) হলো তা, যা সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির ঘনিষ্ঠ বন্ধনে গঠিত। তার মতে, ঐ ক্ষমতা এলিটেরা জনগণকে সিদ্ধান্ত দেবার অবস্থান গ্রহণ করেন। আরেকজন খ্যাতিমান এলিট তত্ত্ববিদ Dahl (1963) ক্ষমতা এলিট বলতে তাদেরকে বুঝিয়েছেন যারা সমাজের উঁচু শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে। Dahl সমাজের উঁচু শ্রেণী বলতে সে সদস্যদের ইঙ্গিত করেছেন যারা সরকারের কেন্দ্রীয় পদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যারা সরকারের অধিকাংশ নীতি নির্ধারণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উঁচু শ্রেণীর লোকেরা সমাজে আধিপত্য প্রকাশে সমর্থ এবং তারা সর্বব্যাপী প্রভাবসম্পন্ন। এলিট তত্ত্বের আরেকদল বিজ্ঞানী (Lasswell, 1952; Kornhauser, 1965) এলিটতত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন- যেমন সমাজ, সমাজ কাঠামো, সমাজ সংগঠন ইত্যাদি। Lasswell (1952) এর মতে, এলিটের সদস্যরা সমাজে উঁচু অবস্থানে থাকেন। প্রায় অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক Cole (১৯৫৬) এলিট বলতে সে দলকে বোঝান যারা সমাজের প্রতিটি পর্যায়কে প্রভাবিত করে। Kornhauser (1965) এলিট বলতে সামাজিক কাঠামোতে উঁচু অবস্থান ধারণকারীদের বুঝিয়েছেন। একই দলভুক্ত বিজ্ঞানীদের আরো একজন অনুসারী Anthony Giddens (1973) এ বিষয়ে সামান্য একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ' এলিট তারাই যারা সামাজিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান পদ দখল করতে পারেন' (Giddens,1973:3-4)।

ওপরে বিশ্লেষিত এলিট সম্পর্কিত অনেক গুণাবলীই একজন গ্রামীণ এলিটের থাকতে পারে। Dube (১৯৫৯) গ্রামীণ এলিট বলতে সেখানকার উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন দলের সদস্যদের কথা উল্লেখ করেন যারা আর্থিক দিক থেকে অবস্থাসম্পন্ন, মর্যাদাসম্পন্ন, শিক্ষিত এবং যাদের শহরের সাথে ভালো যোগাযোগ আছে (১৯৫৯:৩৬-১৩৩)।

Sharma (1979) গ্রামীণ এলিট বলতে সে ব্যক্তিবর্গকে বুঝিয়েছেন যারা গ্রাম পর্যায়ে নেতা ও গ্রামের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেন এবং যারা গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ সমাধান দেন (১৯৭৯:৪৫-১২২) ।

গ্রামীণ এলিট সম্পর্কিত দক্ষিণ এশীয় সমীক্ষাগুলোতে সে লোকদের এলিট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা বিভিন্ন গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে রীতিবদ্ধ অবস্থান দখল করে আছেন। Schulze Ges Blumberg (1957), Bonjean Ges Olson (1964) এবং Jennings (1964) এর অনুসরণে তারা নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে অবস্থানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তারা ঐতিহ্যিক যশস্বী (Reputational) এলিটবর্গকে তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেননি। যদিও এটা সত্য যে, তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে তাদের ঐতিহ্যিক যশ ধরে রাখতে পারছেন না কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, গ্রামীণ ক্ষমতার বেশ খানিকটাই এখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। Karim (1979) বাংলাদেশে রাজশাহীর দু'টি গ্রামের ওপর এক গবেষণায় যশস্বী নেতৃত্বকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু তিনি সরকারি কর্মসূচীর ফলে সৃষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থানিক নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি (Karim,1979: 37)। পরবর্তীতে অবশ্য Karim (1983) অন্য গবেষণায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বাংলাদেশে গ্রামীণ এলিটদের রীতিবদ্ধ ও অরীতিবদ্ধ উভয় ধরনের এলিটই গ্রাম জীবনের বিভিন্ন কাজ-কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে গ্রামকে প্রভাবিত করেন। শ্রীলংকার উদীয়মান এলিটদের ওপর এক সমীক্ষায় Marshall Singer গ্রামীণ এলিট বলতে দলের ভেতর বৌদ্ধ পুরোহিত, ঐতিহ্যিক প্রভাবশালী পরিবার ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। Singer আরো বলেন যে, প্রতিটি গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে আরো অনেক ব্যক্তিবর্গ বা দলসমূহ গ্রামীণ এলিটের সদস্য হতে পারেন (Singer, 1964:59)। Singer-এর এ সংজ্ঞাটি থেকে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতির বহুমুখীতার জন্য নেতৃত্ব প্রবেষণ সম্ভাবনাও ব্যাপকভাবে বহুমুখী। বাংলাদেশে গ্রামীণ এলিট বলতে গ্রামের নেতৃত্বকে বোঝায়। দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যা গ্রামীণ এলাকায় কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের এ গ্রামগুলোতে যারা গ্রামের বিভিন্ন ইস্যুতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন তারাই গ্রামীণ এলিট। অবস্থানিক দিক থেকে তাদের কারো যশস্বী এবং কারো অবস্থানিক ভূমিকা থাকতে পারে।

গ্রামীণ এলিট চিহ্নিতকরণ কৌশল

নেতৃত্ব বিশ্লেষণে নেতাদের চিহ্নিতকরণ একটি অন্যতম বিষয় । গ্রামীণ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোতে Schulze and Blumberg (1957) দু'ধরনের পদ্ধতিতে নেতাদের চিহ্নিত করেছেন: (১) অবস্থানিক কৌশল (২) যশস্বী কৌশল (Schulze and Blumberg, 1957: 63)

(ক) অবস্থানিক কৌশল (Positional Approach)

১৯৫৩ সালে Floyd Hunter Gi Atlanta City -র ওপর গবেষণার পূর্ব পর্যন্ত এলিটদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে অবস্থানিক পদ্ধতি একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল হিসেবে পরিচিত ছিলো (Floyd Hunter, 1953:37-109)। অবস্থানিক এলিটবর্গ হলেন সে সব লোকজন যারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের কর্তৃত্বে অবস্থানিক ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ অবস্থানিক এলিটদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) ইউ.পি.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ; (২) সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ; (৩) প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (গ্রামীণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ)। বর্তমান গবেষণা এলাকায় অবস্থানিক এলিট মোট ১২২জন; এর মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার ২৬জন, সমবায় সমিতি নেতা ২৩জন, প্রাতিষ্ঠানিক এলিট (বিদ্যালয়-মাদ্রাসার শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্য) ৫১জন , রাজনৈতিক দলের ইউপি পর্যায়ের নেতা ১২জন।

(খ) যশস্বী কৌশল (Reputational Approach)

যশস্বী পদ্ধতি অনুযায়ী তারাই নেতা বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শনে যাদের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যথেষ্ট সুনাম, প্রভাব ও প্রতিপত্তি রয়েছে । এ বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা উক্ত এলাকায় বেশ পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন । তাই সহজেই এদেরকে চেনা যায় । সম্প্রদায়ের ক্ষমতা কাঠামোর প্রেক্ষাপটে Floyd Hunter (1953) প্রথম Regional city- তে গবেষণা করতে গিয়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। যশস্বী পদ্ধতির অনেক কৌশলই থাকতে পারে, কিন্তু অধিকতর কার্যকরী কৌশল হচ্ছে ক্রমানুসারে এলিটদের নাম উল্লেখপূর্বক তাদের চিহ্নিত করা এবং এর মধ্যে যারা সবচাইতে বেশি মূল্য বা Weightage পাবেন তারাই যশস্বী নেতা বলে বিবেচিত হবেন। Karim (1990) পুঠিয়া উপজেলার দু'টি গ্রামের নেতাদের চিহ্নিত করতে এবং Harjinder Singh (1976) তার পাঞ্জাবের দু'টি গ্রামে ক্ষমতা ও প্রভাব নির্ণয়ে যশস্বী পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। মূলতঃ এসব প্রধান, মাতব্বর, সর্দার অথবা প্রামাণিকেরা গ্রামগুলোকে অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত করে থাকেন। বর্তমান গবেষণা এলাকায় যশস্বী এলিট মোট ৮৮জন।

(গ) ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশল (Issue Participation Approach)

নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণে ইস্যু পারটিসিপেশন পদ্ধতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ পদ্ধতিকে অনেক সময় Event Analysis, Decision Making অথবা Case Study পদ্ধতি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুতে যারা কর্তৃত্ব করে থাকেন তাদেরকে এলিট বলে ধরে নেয়া হয়। Singh (1976) তাঁর পাঞ্জাবের দু'টি গ্রাম গবেষণায় প্রভাবশালীদের চিহ্নিত করতে যশস্বী কৌশলের পাশাপাশি ইস্যু পারটিসিপেশন

কৌশল ব্যবহার করেছেন (করিম, ২০০২:৮৪-৮৫)। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যাকে চিহ্নিত করে এর পক্ষে জনমত গড়ে তুলে সমস্যা সমাধানে যারা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন তাদেরকে এ পদ্ধতিতে গ্রামীণ এলিট বলা যায়। বর্তমান গবেষণা এলাকায় ইস্যু পারটিসিপেশন কৌশলের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট চিহ্নিত করা যায়নি।

গ্রামীণ এলিটদের চিহ্নিত করার কৌশল বিশ্লেষণের পর গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে গ্রামীণ এলিটদের নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে ভূমি মালিকানা, সম্পদের মালিকানা, শিক্ষা, সনাতন ও আধুনিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায় । তবে Karim দেখিয়েছেন, গ্রামীণ নেতৃত্বের মূল উপাদান এখনো জমির মালিকানার ওপর বেশি নির্ভরশীল (Karim, 1990:38)। তাই বলা যায়, যারা উচ্চ বংশীয় ও স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান ও শিক্ষিত এবং যাদের মধ্যে গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়, তাদেরকেই গ্রামীণ এলিট বলা যায়। গ্রামীণ এসব এলিট নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করে, রেডিও শুনে এবং টেলিভিশন দেখে নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। এছাড়াও তারা তাদের সন্তানদের রাজনীতিতে এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। গ্রামীণ এলিটেরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে প্রায়শঃই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন, যা গ্রামীণ উন্নয়নের একটি ইতিবাচক দিক বলে বিবেচিত হয়। বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ এলিট বলতে বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার এমন ব্যক্তি (বর্গ) কে বোঝানো হবে, যিনি বা যারা তুলনামূলকভাবে উচ্চবংশীয় মর্যাদা, কম-বেশি ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, কম-বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গ্রামীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বীকৃত ভূমিকা পালন- এর এক, একাধিক বা সব ক'টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি(বর্গ)।

ভূমিকা (Role)

এ পরিভাষাটি সমাজতত্ত্ব, সামাজিক মনোবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে দু'টি প্রাবরিত (ওভারল্যাপ্ড) কিন্তু একই সময়ে ভিন্ন অর্থে ও প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে ভূমিকা একটি প্রদত্ত 'সামাজিক অবস্থান' হিসেবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে। এ সামাজিক অবস্থান এক গুচ্ছ (ক) ব্যক্তিগত গুণ এবং (খ) কার্য দ্বারা বিশেষায়িত হতে পারে। সামাজিক আন্তঃক্রিয়া বা ভূমিকা পালন বা সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার একটি উপাদান হিসেবে একটি আন্তঃক্রিয়াশীল পরিস্থিতিতে, 'ভূমিকা'কে এক ব্যক্তির জ্ঞাত কার্যক্রমের ধরনসম্পন্ন পরম্পরা বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

'সামাজিক বিজ্ঞানে প্রায়শঃ কোনো অর্থ নির্ধারণ ব্যতীতই 'ভূমিকা'কে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে' (Neiman & Hugher, ১৯৫১: ১৪১-৪৯) । 'ভূমিকা'-র দু'টি সাধারণ ব্যবহার হলো: (ক) সমাজের একক হিসেবে 'ভূমিকা' এবং (খ) সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার অন্য নাম হিসেবে 'ভূমিকা পালন'। প্রথমটি ব্যবহার করেছেন R. Linton এবং দ্বিতীয়

ধারণার উন্নয়ন ঘটান G.H. Mead (Linton, 1936 Ges G.H. Mead, 1934)।

T.R. Sarbin -এর মতে 'ভূমিকা' হলো আন্তঃক্রিয়াশীল পরিস্থিতিতে এক ব্যক্তির জ্ঞাত কার্যক্রম বা চুক্তির নির্দিষ্ট ধরনসম্পন্ন পরম্পরা (Lindzey, 1954:223-58)।

জনগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। আর এ বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্যই বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত জরুরী (বেগম, ২০০৩:৬৪)। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের কৌশল অতি সম্প্রতি উন্নয়ন সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে (আলম, ২০০৬: ২০৫-২১৭)। আর এই জন অংশগ্রহণে উন্নয়ন প্রচেষ্টার নেতত্বে থাকেন গ্রামীণ এলিট শ্রেণী। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিট শ্রেণী বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখেন।

এক. কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা

ভারতীয় গ্রামীণ এলিটদের ন্যায় (Darshankar,1979:126) বাংলাদেশের গ্রামীণ এলিটেরাও কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রধানতম বাস্তবতা কৃষির উন্নতি হলে রাষ্ট্রীয় উন্নতি সম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক পরিকল্পিত অর্থনীতির উদ্দেশ্য সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন। শুধুমাত্র শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির সম্প্রসারণ দ্বারা সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় । কৃষির উন্নতির ওপর বাংলাদেশের শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। এক কথায় বাংলাদেশের কৃষির উন্নতি এবং দেশের সমৃদ্ধি পরস্পর হতে অবিচ্ছিন্ন। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হওয়ার পরও বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থায় সমস্যা বিরাজমান। এর মধ্যে বর্তমান গবেষণা এলাকায় কৃষির সমস্যার মধ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে সমস্যা, পর্যাপ্ত রাসায়নিক সারের সংকট, উন্নত বীজের অভাব, উন্নত ধরনের চাষপ্রণালীর সমস্যা, কীটপতঙ্গ নাশক ঔষধের অপর্যাপ্ততা, প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ না পাওয়ার সমস্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ফসলের বিভিন্ন রোগের সমস্যা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যমান এসব সমস্যা মোকাবেলা করেও স্থানীয় গ্রামীণ এলিটেরা যে কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছেন তা নিম্নের সারণীতে উপস্থাপিত হলো-

সারণী ১.১: কৃষির উন্নয়নে ভূমিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষির উন্নতিতে ভূমিকা রাখেন	১৩২ জন	৬৬%
কৃষির উন্নতিতে ভূমিকা নেই	৪০ জন	২০%
উত্তর প্রদানে বিরত	২৮ জন	১৪%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

সারণী ১.১-এ লক্ষ্য করা যায়, নিরীক্ষিত গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ১৩২ জন (৬৬%) কৃষির উন্নতির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং সাধ্যমতো কৃষির উন্নতির জন্য কাজ করতে চেষ্টা করেন। মোট ৪০ জন (২০%) কৃষির উন্নতিতে ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই বলে জানান। যদিও দেখা গেছে এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন এবং অনুসারীদের উৎসাহিত করে থাকেন। অবশিষ্ট ২৮জন এলিট (১৪%) এ সংক্রান্ত মতামত প্রদানে বিরত থেকেছেন।

উন্নত জাত এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি উন্নতির জন্য কৃষি ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যার সমাধানের কোনো বিকল্প নেই। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের সংকট কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে অনেক সময় অনিশ্চিত করে তোলে। কৃষি মৌসুমে নিজ এলাকায় প্রয়োজনীয় সারের বরাদ্দ নিশ্চিত করতে গ্রামীণ এলিটেরা সংঘবদ্ধ হয়ে অথবা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন। অন্যদিকে ক্রমাগত আবাদী জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে (প্রথম আলো, ২০১৬:১)। গ্রামীণ এলিটেরা এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে যথাযথভাবে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবহার কৌশল রপ্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কৃষিতে আধুনিক উপকরণ বলতে প্রধানতঃ আধুনিক সেচ, উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশককে বুঝানো হয়ে থাকে (রহমান, ১৯৯৪: ১৩৯)। বর্তমানে চাষ পদ্ধতিতে কিছু কিছু ধনাত্মক পরিবর্তন যেমন চাষাবাদে পাওয়ার ট্রিলার-ট্রাকটরের ব্যবহার, আধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিক কৃষি উপকরণ ব্যবহার, একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন ইত্যাদি লক্ষ্যণীয়। কৃষিতে আধুনিক উপকরণের ব্যাপক ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটাতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন গ্রামীণ এলিটেরা। বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। উচ্চ ফলনশীল ইরি ও বিরি (উফশী) ধান চাষকে জনপ্রিয় করে তুলতে গ্রামীণ এলিটেরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। সকলে মিলে একই জাতের ধানের উৎপাদন করলে স্থানীয় বাজারে সে জাতের ধানের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া সম্ভব হয়। অধিকন্তু সরকারিভাবে কোনো বিশেষ প্রজাতির ধান চাষে স্থানীয় কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে কৃষি বিভাগ পরীক্ষামূলক চাষাবাদ করতে চাইলে তার জন্য প্রয়োজনীয় জমির বরাদ্দ গ্রামীণ এলিটেরাই দিয়ে থাকেন। এছাড়া উন্নত ফলনশীল অন্যান্য ফসল যেমন গম, পাট, আলু, শরিষা, মরিচ, পটল, বেগুনসহ অন্যান্য সবজী উৎপাদনে (বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণসহ) তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। অধিকন্তু নিজ নিজ অনুসারীদেরও উন্নতজাতের ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করেন। বহুমুখী ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ এলিটেরা অর্থনৈতিক সামর্থ্য অব্যাহত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। কারণ অর্থনৈতিক সামর্থ্য সমাজে তাদের মর্যাদার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

ষাটের দশকে এ দেশে প্রবর্তিত আধুনিক সেচ ব্যবস্থার প্রচলন কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে

আসে (হাকিম, ১৯৯৪:১১৭)। হাকিম (১৯৯৪) দেখিয়েছেন যে, সেচ যন্ত্রসমূহ যদি সরকারি মালিকানায় থাকে, এগুলো যদি কৃষকদের মধ্যে ভাড়ায় সরবরাহ করা হয় এবং এগুলোর সরবরাহ যদি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হয়, তাহলে কেবল সেসব কৃষক এগুলো সংগ্রহ করতে পারবে যাদের সাথে সরবরাহকারী সরকারি সংস্থার সম্পর্ক রয়েছে বা যারা সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রয়োজনে কর্মকর্তাদের উৎকোচ-উপঢৌকন দিতে পারে। এ ব্যবস্থায় গ্রামের ক্ষমতা কাঠামো নিয়ন্ত্রণকারী শিক্ষিত ও ধনী কৃষকদেরই সেচ যন্ত্র পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সেচ যন্ত্রসমূহ যদি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, তা হলে এগুলো সাধারণতঃ ধনী কৃষকেরাই সংগ্রহ করতে পারেন, কারণ গরীবদের এগুলো কেনার সামর্থ্য নেই। সুতরাং এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, গ্রামীণ এলিটেরাই উৎপাদনের এ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটির নিয়ন্ত্রণকারী। বর্তমান গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিটেরা গুরুত্বপূর্ণ এ উপকরণটির সাহায্যে কৃষির উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তারা নিজেদের জমিতে স্বল্প সময়ে সেচ প্রদান করার মাধ্যমে এবং নিজ নিজ অনুসারীদের সেচ সুবিধা প্রদান করে ফসল উৎপাদনে কার্যকরী ভূমিকা রাখেন, যা দেশের কৃষির প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানও বটে। অন্যের জমিতে পানি সেচের জন্য অবশ্য গ্রামীণ এসব এলিট মূল্য নিয়ে থাকেন। তবে প্রয়োজনের সময় যেহেতু জমি সেচ ফসল উৎপাদনের প্রধান শর্ত, সেহেতু সময়মতো সেচ সুবিধা পেতে অনুসারী গ্রামবাসীদের এসব গ্রামীণ এলিটের ওপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমান গবেষণা এলাকার নিরীক্ষিত সকল এলিটই একাধিক সেচ যন্ত্রের মালিক। তাই বলা যায়, সেচ প্রযুক্তির মালিকানার মাধ্যমে গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ উন্নয়নে নানামাত্রিক ভূমিকা পালন করেন।

দুই. মৎস্য উৎপাদনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৬.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩৮.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন (বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬:৯১)। মৎস্য সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক। পুকুরে মৎস্য উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান হারে গ্রামীণ এলিটদের অবদানই বেশি। বর্তমান গবেষণা এলাকার বেশিরভাগ পুকুরের মালিকানা গ্রামীণ এলিটদের এবং খাস পুকুরগুলো লীজ নিয়ে তারাই মৎস্য উৎপাদন করে থাকেন। অর্থনৈতিক গুরুত্বের পাশাপাশি মাছের পুষ্টির গুরুত্বও অনেক। পুকুরে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে গ্রামীণ এলিটেরা যেমন নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছেন, তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতে রাখছেন ইতিবাচক ভূমিকা। বর্তমান গবেষণা এলাকায় মৎস্য উৎপাদনের একমাত্র উৎস হলো পুকুর। উন্নত প্রশিক্ষণ লাভের মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য উৎপাদনে তারা নিজেরা যেমন সক্ষমতা দেখিয়েছেন, তেমনি অনুসারীদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে মৎস্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করেন। এছাড়াও পরিত্যক্ত খাস পুকুর, ডোবা ও জলাশয়ে সমবায়ের ভিত্তিতে মৎস্য চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অনুসারিদের দ্বারা তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন

করে থাকেন। বাণিজ্যিকভাবে চাষকৃত এসব পুকুরে গ্রামের কিছু সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায়, মৎস্য উৎপাদনে তাদের নিবিড় ভূমিকায় যেমন তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হয়েছেন, তেমনি অনুসারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

তিন. হাঁস-মুরগী পালনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

পশুপালনের ন্যায় হাঁস-মুরগীর পালনেও গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা অনন্য। সুদূর অতীত থেকেই হাঁস-মুরগী পল্লী অঞ্চলের মানুষের সাংসারিক খরচের একটি সম্পূরক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে (হামিদ, ১৯৮৮:২৩২)। সনাতন পদ্ধতির হাঁস-মুরগী পালনের পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পালনে মুনাফা বেশি হয়। ফলে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগীর পালন দিন দিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। হাঁস-মুরগী পালনের সাথে জড়িত লোকসংখ্যাও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। অর্থাৎ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এটি একটি চমৎকার খাতে পরিণত হয়েছে। হাঁস-মুরগী থেকে প্রচুর পরিমাণ প্রানিজ আমিষ পাওয়া যায়। এ ছাড়া হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হাঁস-মুরগীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব এমন নানামাত্রিক হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগীর পালন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ছোটো ছোটো খামারভিত্তিক হাঁস-মুরগীর পালন সহজসাধ্য অথচ লাভজনক। গ্রামীণ এলিটেরা সচেতন এবং কিছুটা শিক্ষিত হওয়ায় হাঁস-মুরগী পালনে বেশ সুবিধা করতে পারেন। কারণ হাঁস-মুরগীর বিজ্ঞানসম্মত পালনের পদ্ধতি জানতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। গবেষণা এলাকার অনেক গ্রামীণ এলিটই ঐচ্ছিক পেশা হিসেবে হাঁস-মুরগী পালনকে বেছে নিয়েছেন এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। এসব গ্রামীণ এলিটের অনেকেই আবার এ সংক্রান্ত উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বিশেষতঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর জেলা শাখা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া নিয়মিতভাবেই এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। আগ্রহী গ্রামীণ এলিটেরাও এসব প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামীণ এলিটেরা প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে হাঁস-মুরগী পালনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। ফলে তারা হাঁস-মুরগীর ডিম সংরক্ষণ, বাচ্চা ফুটানোর উপযোগী ডিম নির্বাচন, বাচ্চা উৎপাদন ও ইনকিউবেটের যন্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। এ ছাড়া এসব প্রশিক্ষণে হাঁস-মুরগীর আদর্শ খাদ্য তালিকা, মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় টিকা দান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে পারেন তারা। তাই তারা প্রশিক্ষণ শেষে প্রয়োজনীয় অর্থায়নে হাঁস-মুরগী খামার তৈরী করে গবেষণাধীন অঞ্চলে হাঁস-মুরগী পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এছাড়াও তারা হাঁস-মুরগী পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রামবাসী বিশেষতঃ নিজস্ব অনুসারীদের উৎসাহিত করে থাকেন। কৃষির ওপর অতি নির্ভরশীলতা

কমিয়ে পোল্ট্রি খামারের প্রতি তাদের এ মনোযোগ তাদের আর্থিক সচ্ছলতার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এছাড়াও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সৃষ্টি হচ্ছে বাড়তি কর্মসংস্থানের। এ খাতকে আরও শক্তিশালী করতে আর্থিক সহযোগিতা, উৎপাদিত মুরগী এবং ডিমের বাজারজাতকরণ এবং ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থা এবং সহজে প্রয়োজনীয় টিকা এবং ভ্যাকসিন সরবরাহের জন্য তারা সুপারিশ করেন।

চার. বৃক্ষরোপণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে একটি দেশের আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ এলাকায় বনভূমি থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। কিন্তু বাংলাদেশের বনভূমি ১১ শতাংশ (স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস ফরেস্ট-২০১৬ প্রতিবেদন)। যদিও বন বিভাগের দাবি অনুযায়ী এই পরিমাণ ১৭ শতাংশ (প্রথম আলো, ২০১৬:১)। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির যেমন বিরাট ভূমিকা রয়েছে তেমনি সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। গাছের বহুমাত্রিক উপকারিতা এ পৃথিবীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। স্থানীয় এলাকায় সামাজিক বনায়ণ কর্মসূচীকে সফল করতে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই হোক আর গ্রাম পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্বের মাধ্যমেই হোক গ্রামীণ এলিটদের সহযোগিতা তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকন্তু নিজেদের পতিত জমিতে, পুকুরের পাড়ে অথবা ফসলি জমির আইলে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন। নিরীক্ষিত এলিটদের অধিকাংশেরই বনজ অথবা ফলজ বাগানের মালিকানা রয়েছে যেখান থেকে তারা সাংসারিক ব্যয়ের বিপরীতে উদ্বৃত্ত আয় করতে সক্ষম হোন।

পাঁচ. গবাদি পশুপালনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

বাংলাদেশে সীমিত আকারে এ খাতটি গড়ে উঠলেও ভবিষ্যতে খাতটিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করলে জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হয়। এখানে প্রথাগতভাবে গবাদিপশু চাষাবাদ ও পরিবহণের কাজে এবং হাঁস-মুরগী গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষের সাংসারিক খরচের একটি সম্পূরক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতদসত্ত্বেও এ দেশের অর্থনীতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী খাত একত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে। বিনা পুঁজিতে গবাদি পশুপালনে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠী গবাদি পশু বর্গা গ্রহণে বেশি আগ্রহ দেখায়। এর ফলে গ্রামীণ এলিট এবং অনুসারী গ্রামবাসীদের মধ্যে পোষক-পোষ্য (প্যাট্রন-ক্লায়েট) সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

গ্রামীণ এলিটেরা গবাদী পশু পালনে যেসব ভূমিকা পালন করেন তা হলো-

১. গবাদি পশুর খোয়াড় রক্ষনাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা,

২. গবাদি পশু পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুসারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা এবং গবাদী পশু পালনে তাদের উদ্বুদ্ধ করা,

৩. গবাদি পশু পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং গবাদি পশুর রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা,

৪. উন্নত জাতের গবাদি পশু পালনে অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা,

৫. এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করা এবং প্রশিক্ষণ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা ইত্যাদি ।

ছয়. সমবায় সমিতি গঠনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

স্বেচ্ছায় একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাই সমবায় (হামিদ, ১৯৮৮:১৫৪) । বাংলার পল্লী উন্নয়ন উদ্যোগের সূচনা গত শতকের প্রথম দশকে । প্রথম দশকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশের দশকে জিএস দত্ত, তিরিশের দশকে ড্যানিয়েল হ্যামিলটন এবং চল্লিশের দশকে এইচএএস ইছহাকের মতো ব্যক্তি উদ্যোগের হাত ধরে যে প্রক্রিয়ার সূচনা তা পাকিস্তান আমলে এসে গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন বা ভি-এইড (V-AID) নামে সরকারি কর্মসূচীর মাধ্যমে বিপুলভাবে যাত্রা শুরু করে (ইসলাম, ২০০৩: ২৩১) । মূলতঃ বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সমবায় আন্দোলন শুরু হয় ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান আইন পাশের মাধ্যমে । ১৯২৯ সালে মহামন্দার সময়ে এর অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হলেও পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর তা আবার জোরদার হয়ে উঠে (হামিদ, ১৯৮৮:১৫৪) । ভি-এইডের অনুষঙ্গ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন থিংক ট্যাংক 'কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী' । অনুরূপ আরেকটি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় বগুড়া জেলার গবেষণাধীন উপজেলায় । কখনো জার্মানীর 'রাই কেসেন' সমবায় ব্যবস্থার মতো, কখনোবা ডেনমার্কের 'ফোক স্কুল' কাঠামো অনুকরণ করে গঠন করা হয় কৃষক সমবায় সমিতি । কিন্তু যে ধরনের পদ্ধতির অনুকরণে বা অনুসরণে তৈরী হোক না কেন, এ সকল সমবায় সমিতি গঠনের মৌল উদ্দেশ্য ছিলো কৃষি আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে কৃষকদের কাছে প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবস্থা করা । কিন্তু সুদূর অতীত থেকেই মহাজন নির্ভর অর্থায়ন উৎসটিই কৃষি প্রবৃদ্ধির জন্য নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছিলো । সমবায় সমিতিগুলো এ চক্রভাঙ্গার প্রয়াস চালায় । যদিও উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই সমবায় আন্দোলনকেই একটি চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়তে দেখা যায় ।

যদিও সমবায়ের ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে গ্রামীণ এলিটদের দায়ী করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করা হয় কিন্তু কার্যতঃ সমবায় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য গ্রামীণ এসব এলিট ব্যতীরেকে অন্য শ্রেণী পেশার মানুষও পাওয়া যায়নি (ইসলাম, ২০০৩:১৮৯) । আবার, আবু ইলিয়াস সরকার বর্ণনা করেছেন, গ্রামের এলিটদের আধিপত্যকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র ব্যর্থতা শুধু প্রশাসনিক নয়, এটা গ্রামীণ এলিটদের অদম্য ক্ষমতারও ইঙ্গিত দেয় । গ্রামীণ এলিটেরা কার্যতঃ সরকারি

সম্পদে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে যা কিনা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ন ও গ্রামের পৃষ্ঠপোষকতার ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (সরকার, ১৯৯২:৩৩-৩৯)। কিন্তু বিআরডিবি'র ব্যর্থতার দায়ভার দিয়ে গ্রামীণ এলিটদের ক্ষমতা লিপ্সার এ চিত্র উন্মুক্ত করা হলেও অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিআরডিবি'র সীমিত যে কার্যক্রম এখনো পরিচালিত হচ্ছে সেখানেও গ্রামীণ এলিটদের একচ্ছত্র নেতৃত্ব বিদ্যমান এবং ক্ষেত্র বিশেষে সমাজ নেতা এবং সমবায় নেতা এক ও অভিন্ন (Karim, 1990:98-120)। এ ছাড়া ইসলাম (২০০৩) মেহের পঞ্চগ্রামের সমবায় নেতৃত্ব চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, একই নেতা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা তিনি চিহ্নিত করেছেন তা হলো, গ্রামীণ এলাকার সনাতন নেতৃবৃন্দই সমবায় আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করছেন (ইসলাম, ২০০৩:১৮৭-১৯৩)। এছাড়া একই নেতার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান এটাও নিশ্চিত করে যে, বিকল্প উন্নয়ন মডেল বাস্তবায়নে বিকল্প বা নতুন ধরনের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা মোটেই অপরিহার্য নয়। প্রয়োজন নতুন বা স্বতন্ত্র ধ্যান ধারণা ও উন্নয়ন মানসিকতা (ইসলাম, ২০০৩:১৯১)। গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষাপটে এসব গুণের সমাবেশ ঘটে একমাত্র গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর নেতৃত্বে। তারাই গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়নের উদ্দীপক হিসেবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের মূলমন্ত্র ছড়িয়ে দিতে পারেন। নেতৃত্বের জন্য সংগঠিত জনসমষ্টির সমর্থন প্রয়োজন যা গ্রামীণ নেতৃত্বের অধিকারী গ্রামীণ এলিটদের থাকে। ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ যথেষ্ট ফলপ্রসূতা অর্জন করে। সমবায় নেতৃত্বের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক স্বাবলম্বীতা অর্জনে তাদের ভূমিকা তাই প্রশংসার দাবি রাখে। বর্তমান গবেষণা এলাকায় গ্রামীণ নেতৃত্বের অধিকারী গ্রামীণ এলিটদের এ সংশ্লিষ্ট প্রয়াসে অন্ততঃ সেই সত্যতারই প্রমাণ মেলে।

বর্তমান গবেষণা এলাকায় কুমিল্লা মডেলের 'শেষ বংশধর' হিসেবে বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত ইউসিসিএ (উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি) এর অধীনে কেএসএস (কৃষক সমবায় সমিতি) সীমিত পরিসরে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচিত মির্জাপুর ইউনিয়নে ৮টি এবং বিশালপুর ইউনিয়নে ১৮টি সংগঠনের অস্তিত্বের কথা জানা যায় কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব সংগঠনের অধিকাংশই অকার্যকর।

বর্তমান গবেষণা এলাকার বিআরডিবি'র পরিচালনায় স্থানীয় এলাকায় কেএসএস তার ভঙ্গুর কাঠামো নিয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিলেও এসব সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করছে, পূর্বোক্ত গবেষকদের (Rumi, 1985; Karim, 1990) ন্যায় এমনটি দাবি করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ সমাজ নেতা ও সমবায় নেতা এক ও অভিন্ন (Karim, 1990)-এ পর্যবেক্ষণের কোনো সত্যতা বর্তমান গবেষণা এলাকায় পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে দেখা যায়, কিছু কিছু সমবায় সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও কার্যক্রম নেই বললেই চলে।

তাছাড়া এসব সমবায় সমিতির নেতৃত্ব প্রদানকারী অনেকেই গ্রামীণ এলিট মর্যাদার অধিকারী নয়। এসব সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেবল যারা এলিট মর্যাদার অধিকারী তারা সীমিত আকারে হলেও স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। বলা যায়, এসব সমবায় সমিতির অস্তিত্ব এসব গ্রামীণ এলিটের কার্যতৎপরতার ওপর নির্ভরশীল। তাদের এ তৎপরতায় কুমিল্লা মডেলের 'শেষ বংশধর' এ সমবায় সমিতিটি সীমিত আকারে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

সঞ্চয় সমিতি গঠনে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এসব এলিট ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগের মাধ্যমেও যৌথ পুঁজি গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় সমিতি গড়ে তোলেন। এসব সঞ্চয় সমিতির সদস্যদের সপ্তাহে নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়ী চাঁদা প্রদান করতে হয়। সঞ্চয়কৃত পুঁজি থেকেই চাহিদা অনুযায়ী সঞ্চয়ের নির্দিষ্ট পরিমাণের অনুপাতে সমিতির সদস্যদেরকে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে তাদেরকে মাসিক হারে সুদসহ কিস্তি প্রদান করতে হয়। ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সুদ এসব সঞ্চয় সমিতির আয়ের একমাত্র উৎস। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে (সাধারণতঃ বছর শেষে) সমবায় সমিতির সমস্ত হিসাব সম্পন্ন করে সমিতির সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয় অথবা সমিতির সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে সমিতি ভেঙ্গে দিয়ে সঞ্চিত পুঁজি এবং লভ্যাংশ সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এসব সমিতি গঠনের উদ্যোগ থেকে শুরু করে সমিতির কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে গ্রামীণ এলিটেরা কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের দৃশ্যমান ভূমিকা হিসেবে এ ধরনের সঞ্চয় সমিতি গঠনকে সাম্প্রতিক প্রবণতা হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া এ ধরনের সঞ্চয় সমিতির সাথে সরকারি কোনো পৃষ্ঠপোষকতা নেই, নেই কোনো প্রশাসনিক জটিলতা এবং ঋণ আদান-প্রদানের দীঘসূত্রিতা। অধিকন্তু এসব সঞ্চয় সমিতিতে ঋণ আদায়ের সফলতার হারও শতভাগ। মূলতঃ স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণের ফলে এ ধরনের সংগঠনের প্রতি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকে। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরী হয়, তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং আপদকালীন সময়ে সহজ শর্তে দ্রুততম সময়ে অর্থ ঋণ নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারে। ফলে গ্রামীণ মহাজনী ব্যবস্থা অনেকটাই নিশ্চিহ্ন হয়েছে বলা যায়। যদিও এ ধরনের সঞ্চয় সমিতির গঠনকে কেন্দ্র করে দু'একটি ক্ষেত্রে আর্থিক অব্যবস্থাপনা এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে কিন্তু এটাও সত্য যে, এ ধরনের সঞ্চয় সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় তারাই নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামীণ গঠনে এলিটদের ভূমিকা

যুব উন্নয়ন কেন্দ্রের সহযোগিতায় গবেষণাধীন এলাকার বিভিন্ন গ্রামে যুব উন্নয়ন সমবায়

সমিতি গড়ে উঠেছে এবং এতে গ্রামীণ এলিটদের বংশধর যুবক শ্রেণীর নেতৃত্বের আধিক্য লক্ষ্যণীয়। যুব উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে (মৎস্য, পশুপালন, মুরগীপালন ইত্যাদি) এসব সমিতির সদস্যরা অংশ নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কৌশল রপ্ত করে এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ (যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে আর্থিক ঋণ পাওয়া সাপেক্ষে) করে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করে থাকে। গ্রামীণ যুব শ্রেণীর মধ্যে কর্মস্পৃহা জাগ্রত করে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সবোপর্রি গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ধরনের সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এনজিও প্রতিষ্ঠায় গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

এসব সমিতি সংগঠনের পাশাপাশি কিছু উদ্যমী গ্রামীণ এলিট উপজেলা সমবায় অফিস অথবা সমাজসেবা অফিসের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠা (এনজিও) করে স্থানীয় ভিত্তিতে সঞ্চয়ী কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। এসব সংস্থা মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং ক্ষুদ্র ঋণভিত্তিক এনজিও। ব্যক্তিকেন্দ্রিক এনজিও হওয়ায় স্থানীয় এলাকার অনেকেই একে দরিদ্র শ্রেণী শোষণের নব্য কৌশল বলে আখ্যায়িত করে থাকেন এবং সনাতন সুদভিত্তিক মহাজনী ব্যবস্থার আধুনিক সংস্করণ হিসেবে গণ্য করতে চান। পুঁজি গঠনের কৌশল তৈরীতে এবং দরিদ্র শ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব স্থানীয় এনজিও'র কার্যকারিতা নেহায়েত কম নয়। সারণী ১.২ এর মাধ্যমে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা অনুধাবনের চেষ্টা করা হবে-

সারণী-১.২: সমবায় এবং সঞ্চয় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
সমবায় সমিতি ভূমিকা রাখেন	১৩৭ জন	৬৮.৫%
সমবায় সমিতি গঠনে ভূমিকা নেই	৪৭ জন	২৩.৫%
মতামত প্রদানে বিরত	১৬ জন	৮%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্রঃ মাঠ জরিপ

সারণী ১.২-এ লক্ষ্য করা যায়, উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ১৩৭ জন (৬৮.৫%) গ্রামীণ এলিট বিভিন্ন সমবায় সমিতি অথবা সঞ্চয় সমিতির সাথে সম্পৃক্ত এবং প্রধান উদ্যোক্তা। এ ধরনের সমিতি গঠনের মাধ্যমে তারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক

স্বাবলম্বীতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছেন বলে দাবি করেন। সমিতিতে সঞ্চিত অর্থ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিপদের বড় সংগ্রহ হিসেবে গচ্ছিত থাকে। ফলে প্রয়োজনের সময় এসব সমিতি থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ পাওয়া যায় । তাছাড়া এ ধরনের সমিতি সংগঠনের তৎপরতায় গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পাচ্ছে বলে তারা মনে করেন। ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে এসব সমবায় সমিতি। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আনুষ্ঠানিক ঐক্যবদ্ধতাও তৈরী হয় যাতে করে তারা আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক একক হিসেবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারে। অন্যদিকে ৪৭ জন (২৩.৫%) গ্রামীণ এলিট সমবায় সমিতি অথবা সঞ্চয় সমিতি গঠনের সাথে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে জানিয়েছেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে সুদভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে চান না। তাদের কেউ কেউ অবশ্য সাংসারিক প্রয়োজনে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ক্ষেত্র বিশেষে শহরের বড় বড় সুদী মহাজনদের কাছ থেকে গহনা বা জমির দলিল বন্ধকের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন বলে জানা যায়। তবে এটা তারা নিতান্তই সাংসারিক প্রয়োজনে করে থাকেন, সঞ্চয়ের বিলাসিতা থেকে নয় বলে দাবি করেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং রক্ষণশীল মনোভাবের অধিকারী। বাকী ১৬ জন (৮%) গ্রামীণ এলিট এ সংক্রান্ত প্রশ্নের মতামত প্রদানে বিরত থেকেছেন। মূলতঃ এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটদের কেউ কেউ বিভিন্ন সমবায় সমিতি অথবা সঞ্চয় সমিতির সাথে জড়িত থাকলেও তারা তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না চাওয়ায় উত্তর প্রদানে বিরত থেকেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

সাত. জমি বর্গাদানের মাধ্যমে দারিদ্যতা দূরিকরণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ সমাজে জমির মালিকানা এলিটীয় মর্যাদার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা জমির মালিকানা যেমন তাদের আর্থিক সচ্ছলতার সাথে জীবন যাপন করার নিশ্চয়তা দেয় তেমনি তাদের অনুসারীদের দারিদ্র্য দূরিকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে জমি বর্গাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। সারণী-১.৩ এ গ্রামীণ এলিটদের এ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা চিত্রিত করা হলো-

সারণী-১.৩ মালিকানাধীন জমি বর্গাদানের ভিত্তিতে গ্রামীণ এলিট

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষির উন্নতিতে ভূমিকা নেই	৪০ জন	২০%
উত্তর প্রদানে বিরত	২৮ জন	১৪%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

সারণী ১.৩ এ লক্ষ্য করা যায়, উত্তরদাতা গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে মোট ১৫৯ জন (৭৯.৫%) গ্রামীণ এলিট তাদের জমি বর্গাচাষে দেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা ধনী কৃষক, যারা নিজেরা চাষাবাদ করেন এবং অপরকেও কিছু জমি বর্গাচাষে প্রদান করেন। কোনো কোনো এলিট অন্য পেশায় নিয়োজিত থাকায় (ব্যবসা অথবা চাকুরি) তাদের সমস্ত জমি বর্গাচাষে প্রদান করেন। বর্গা দেয়ার ক্ষেত্রে এসব গ্রামীণ এলিটেরা তাদের অনুসারীদের প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বর্গাচাষের অর্থনৈতিক গুরুত্বও ব্যাপক। এ অর্থনৈতিক গুরুত্বকে অনুধাবন করেই ১৯৫৩-এর আইনে বর্গাচাষ (ভাগচাষ) প্রথাকে সমর্থন দেয়া হয়। তবে ১৯৮৪ সালের আইনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

(ক) ভাগচাষী ও জমির মালিকের সাথে ন্যূনতম ৫ বছরের জন্য একটি লিখিত চুক্তি থাকবে।

(খ) মালিক ও ভাগচাষীর মধ্যে শস্য বন্টনের নতুন নীতি অনুযায়ী উৎপাদিত ফসলের ১/৩ অংশ মালিক (তার জমির জন্য), ১/৩ অংশ ভাগচাষী (তার শ্রমের জন্য) এবং ১/৩ অংশ উপকরণ সরবরাহকারী (ভাগচাষী কিংবা মালিক যিনিই সরবরাহ করবে) পাবে। যে ক্ষেত্রে সকল উপকরণ মালিক ও ভাগচাষী সমভাবে সরবরাহ করবে, সে ক্ষেত্রে ফসল ৫০:৫০ হিসেবে ভাগ হবে (হামিদ, ১৯৮৮:৩৬-৩৭)। কিন্তু ১৯৮৪ সালের ভাগচাষ সংস্কার আইন জারী হলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করার কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। গবেষণা এলাকার গ্রামীণ এলিট ও তাদের অনুসারীরাও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে এখনো আন্তঃসম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায় ভাগচাষ চুক্তি মৌখিকভাবে হয়। এখানে ভাগচাষীদের উৎপাদন খরচে গ্রামীণ এলিটেরা কোনো ব্যয় বহন করেন না। বর্তমানে ভাগচাষের চুক্তি অনুযায়ী বর্ষা মৌসুমে (আমন ফসল) মালিক এবং ভাগচাষীদের মধ্যে উৎপাদিত ফসলের ৫০:৫০ ভাগ হয় এবং ইরি-বোরো মৌসুমে বিঘা প্রতি ৩ মন হারে ধান মালিক গ্রামীণ এলিটকে দিতে হয় এবং উৎপাদন খরচ ভাগচাষীকে একাই বহন করতে হয়। যদিও আপাততঃ দৃষ্টিতে এ ধরনের চুক্তিতে ভাগচাষীদের মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা খুব কম থাকে তারপরও ভাগচাষ ব্যবস্থায় জমি বর্গা নিতে প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। অধিকন্তু বর্গাচাষ ব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি উদ্ভব হওয়ায় ভাগচাষীদের মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়া যায় না। নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী জমি বর্গা নেয়ার পূর্বেই খণ্ডকালীন অথবা বাৎসরিক ফসলের দাম ধরে মালিক পক্ষের প্রাপ্ত অর্থ বর্গাচাষী কর্তৃক পরিশোধ করতে হয়। এতে করে ঐ এক বছর অথবা এক ফসলের যাবতীয় উৎপাদিত ফসলের মালিকানা বর্গাচাষীর হয়। মূলতঃ কৃষি ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তির আবির্ভাব এবং জমিতে উন্নত বীজ, সার এবং কীটনাশকের ব্যবহার কৃষিতে মুনাফা বয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। তাই বর্গাচাষেও লাভবান হওয়া যাচ্ছে। সুতরাং বলাই যায়, গ্রামীণ এলিটেরা তাদের মালিকানার জমি নিজ অনুসারীদের বর্গাচাষে দিয়ে গ্রামীণ সমাজের দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন। উত্তরদাতা গ্রামীণ

এলিটদের মধ্যে মোট ৪১ জন (২০.৫%) এলিট নিজেদের জমি বর্গাচাষে দেন না বলে জানিয়েছেন। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা নিজের মালিকানার সমস্ত জমি নিজেই চাষাবাদ করে থাকেন। তাদের উদ্বৃত্ত জমি না থাকায় জমি বর্গাচাষ দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

আট. কৃষিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গ্রামীণ এলিট

গ্রামীণ এলিটেরা নিজ গ্রামের ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কোনো কোনো গ্রামীণ এলিট কৃষি মৌসুমে আবার কোনো কোনো এলিট সারা বছরব্যাপী সাংসারিক কাজের প্রয়োজনে মাসভিত্তিক অথবা বছরভিত্তিক কাজের লোক নিয়োগ করেন। কাজের লোক নিয়োগের বেতন কাঠামোও খারাপ নয়। অতীতে ৫০০-৭০০ টাকা মাস হিসেবে কৃষি শ্রমিকদের নিয়োগ দেয়া হতো, বর্তমানে তা ৫০০০-৬০০০ টাকায় পৌঁছেছে। এ ছাড়া খোরাকি (বাৎসরিক খাবার খরচ) বাবদ নিয়োগকর্তা এলিটের বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাতো থাকেই। তবে কাজের সময়সীমা সকাল ৬টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত যা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) আইনের পরিপন্থী। তবে ভরা কৃষি মৌসুমে কাজের চাপ থাকলেও অন্যান্য সময়ে সংসারের টুকটাক কাজ করেই তারা সময় অতিবাহিত করে। মাসভিত্তিক অথবা বছরভিত্তিক লোক নিয়োগ ছাড়াও গ্রামীণ এলিটেরা সাংসারিক এবং কৃষির বিভিন্ন কাজে দিনভিত্তিক অথবা চুক্তিভিত্তিক লোক নিয়োগ করে থাকেন। বিশেষ করে কৃষিতে যখন কাজ থাকে না তখন সাংসারিক নানা প্রয়োজনে তারা দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে শ্রমিকদের কাজ প্রদান করেন। মোট কথা গ্রামীণ এসব এলিট নিজের কৃষি জমিতে লোক নিয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন, তেমনি দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখেন।

কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গ্রামীণ এলিট

নিজেদের কৃষি কাজে লোক নিয়োগ ছাড়াও গ্রামীণ এসব এলিট তাদের অনুসারী গ্রামবাসীদের শহরে কোনো বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুযোগ দানের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখেন। গ্রামীণ এলিটদের পরিচিত অথবা আত্মীয়দের প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় এনজিওসমূহে পিওন অথবা স্বল্প শিক্ষিত অনুসারীদের করনিক কাজে নিয়োগ দিতে তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালান। এছাড়া পরিচিত অথবা আত্মীয়দের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনুসারীদের মাসভিত্তিক বেতনে চাকুরি পাইয়ে দিতে এলিটদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

স্থানীয় বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ গ্রামীণ এলিটদেরই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকে (সম্প্রতি এই বিধিমালা বিলুপ্ত করা হয়েছে)। তাই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো পদশূন্য হলে তার বিপরীতে গ্রামীণ এলিটেরা নিজ নিজ অনুসারীদের নিয়োগ দানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তবে এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক

প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রামীণ এলিটেরা নিজ অনুসারীদের নিয়োগ দানের জন্য পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে থাকেন এবং প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে ঘুষ-দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতেও তারা দ্বিধা করেন না। মর্যাদার লড়াইয়ে জয়ী হতে এ ধরনের ব্যয় করতে তারা কুষ্ঠিত হন না। কখনো কখনো গ্রামীণ এলিটেরা নিজ নিজ অনুসারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ছোটো-খাটো ব্যবসা করার জন্য পুঁজি সংগঠনের ব্যবস্থা করে থাকেন। হাট-বাজারে মুদি দোকান-কাঁচা সবজির দোকান প্রতিষ্ঠা এ ধরনের উদ্যোগের মধ্যে থাকে। এ ছাড়াও হাঁস-মুরগীর খামার-নার্সারী প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে অনুসারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

নয়. নিজ এলাকায় হাট-বাজার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পণ্যের বিপণনে এলিটদের ভূমিকা

উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা একটি অন্যটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা না থাকলে উৎপাদিত পণ্যের আশানুরূপ মূল্য পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে বিপণন ব্যবস্থার কাঠামো বেশ জটিল। সাধারণভাবে বিপণন বা 'বাজার' বলতে কেনা-বেচাকে বুঝানো হয়। স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করলে পাওয়া যায় প্রাথমিক বাজার। এর মধ্যে দু'রকমের বাজার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এক. গ্রাম্য বাজার যা সাধারণতঃ ১ থেকে ৩ মাইলের মধ্যে দেখা যায়। এ বাজারে প্রায় সব কিছুই খুচরো কেনা-বেচা হয়। প্রতিদিনই এ বাজার বসে। দুই. 'হাট' যা সপ্তাহে ১ বা ২ দিন বসে। এতে খুচরো ও পাইকারী উভয় প্রকারের জিনিসপত্র কেনা-বেচা হয়। এখানে উৎপাদকরা তাদের দ্রব্য-সামগ্রী সরাসরি ভোক্তা ছাড়াও মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট বিক্রয় করার সুযোগ পায় (হামিদ, ১৯৮৮:২১৯)। গবেষণা এলাকায় এ ধরনের বাজার-হাট প্রতিষ্ঠায় গ্রামীণ এলিটদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় এবং বাজার-হাটের সম্প্রসারণেও তারা ভূমিকা রাখেন। সাম্প্রতিক অতীতে বিশালপুর ইউনিয়নের জামাইল হাট প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় এলিটদের তৎপরতা ছিলো লক্ষ্যণীয়। মূলতঃ স্থানীয় এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য তারা এ ধরনের হাট-বাজার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে থাকেন। এতে খুচরা ও পাইকারী উভয় প্রকারেরই জিনিস-পত্র কেনা-বেচা হয়। এখানে উৎপাদকরা তাদের দ্রব্য- সামগ্রী সরাসরি ভোক্তা ছাড়াও মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট বিক্রয় করার সুযোগ পায়। বেপারী, পাইকার, ফড়িয়াসহ বিভিন্ন রকমের মধ্যস্বত্বভোগীগণ এ হাটে মালপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে। এসব হাট-বাজার সম্প্রসারণেও গ্রামীণ এলিটেরা ভূমিকা রাখেন।

গবেষণাধীন বিশালপুর ইউনিয়নের কহিতকুল এবং বামিহাল গ্রামের মধ্যবর্তী স্থান চৌমুহনীতে প্রাত্যহিক বাজার স্থাপনের জন্য উভয় গ্রামের গ্রামীণ এলিটদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। এ বাজার স্থাপিত হলে দূরবর্তী শেরপুর, মির্জাপুর এবং রাণীরহাটের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে বলেই তাদের এ ধরনের উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

দশ. সরকারি সম্পত্তি রক্ষায় ভূমিকা

বাংলাদেশের সার্বিক ভূমি ব্যবস্থায় সরকারি খাস ও দখলযোগ্য জমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষণা এলাকায় খাস জমির মধ্যে সার্টিফিকেট প্রথায় প্রাপ্ত জমি, পরিত্যাগ, প্রত্যর্পণ বা বাতিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারের ওপর অর্পিত জমি, হাটবাজারসহ অন্য কিছু খাস জমি রয়েছে। সরকারি খাস জমিতে আশ্রয়ন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে তাতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনেও ভূমিকা রাখে গ্রামীণ এসব এলিট। অধিকন্তু গবেষণা এলাকায় যেসব সরকারি সম্পত্তি রয়েছে যেমন হাট-বাজারে প্রতিষ্ঠিত পাকা ঘর, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিল্ডিং, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও সরকারি গাছ-গাছালি সংরক্ষণে গ্রামীণ এলিটেরা সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

এগার. অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গোষ্ঠী জীবনকে সংরক্ষণের জন্য সমাজ জীবনে পারস্পরিক লেন-দেনের সূচনা ঘটেছিলো। এসব পারস্পরিক লেন-দেন এবং আদান-প্রদান থেকেই গ্রামীণ জীবনে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটেছে (হোসেন, ২০০৪:১৫৯-১৭৬)। মূলধন সংকট এ দেশের কৃষক সমাজের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, ধনী কৃষক ও গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আপদকালীন আর্থিক সচ্ছলতা মোকাবেলা করা এতদঞ্চলে এক চিরায়ত ব্যবস্থা। বাংলাদেশে ভূমিহীনতার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সাথে ঋণগ্রস্থতার সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন গ্রাম গবেষণায় এ ব্যাপারে ঐকমত্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে Mukherjee (1971); Wood (1978); Arens and Van Beurden (1977); Van Schendel (1982) ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সাথে ঋণের সম্পর্কের যোগসূত্র লক্ষ্য করেছেন। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি বন্ধকের বিদ্যমান প্রবণতাকে একটি গবেষণায় (Hussain, 1987) তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থার ওপর উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো গবেষণা হয়নি বললেই চলে। তবে, গ্রামীণ ঋণের ওপর বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি গবেষণাকর্ম (Socio-economic survey Board, 1956; government of Pakistan, 1962; Registrar of co-operative society, 1967) হয়েছে। এসব গবেষণায় অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংক্রান্ত আলোচনাও স্থান পেয়েছে। এছাড়াও গ্রামীণ পর্যায়ে কিছু নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় (Bertocci, 1970; Arefeen, 1983; Arens and Beurden, 1977; Herbon, 1985; Blanchcet, 1986; Maloney and Ahmed, 1988; Karim, 1990; Mc Gregor, 1992) অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে পল্লী ঋণের উৎসসমূহকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। অপ্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক (হোসেন, ১৯৯৪: ১৬৬; হামিদ, ১৯৮৮)। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়, অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে কোনো আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না (Islam, 1985:97)। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়, প্রতিবেশী, ধনী ভূ-স্বামী,

দোকানদার, ব্যবসায়ী, গ্রাম্য মহাজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (Islam, ১৯৮৫:৯৭; হামিদ, ১৯৮৮)। বাংলাদেশে গ্রামীণ ঋণ সরবরাহে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহের ভূমিকা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ এখনো প্রধান ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

গ্রামীণ সনাতনী অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, যা গ্রামীণ এলিটেরা তাদের অনুসারীদের দিয়ে থাকেন, তা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। ঋণের পরিমাণ কম হোক অন্ততঃ সুদের বোঝা বইতে হয় না। অবশ্য গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় শক্ত অবস্থানের জন্য অথবা ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব বিস্তারের জন্য এসব ঋণ প্রদান করে থাকেন বলে ধ্রুপদী গবেষকগণ দেখিয়েছেন (Bertocei, 1970, Karim, 1990)। তবে বর্তমান গবেষকের উপলব্ধি হলো, বিনাসুদে দ্রুততম সময়ে, অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় এবং মৌখিক চুক্তিতে এ ঋণ সুবিধা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যত কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে তা অন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই একে সামাজিক পুঁজি হিসেবেই গণ্য করা উচিৎ (রহমান, ২০০৩:২১-৪২) এবং এ ঋণ প্রদানে গ্রামীণ এলিটদের মনোভাবের চেয়ে তা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে কী-না সেটাই বিচার্য বিষয়। দিন মজুরদের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা কম। তাই ঋণের জন্যও তাদের নিভ্রর করতে হয় তাদের প্রতিপোষকদের অর্থাৎ গ্রামীণ এলিটদের ওপর। অন্যদিকে প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের অধিকাংশই ঋণগ্রস্থ ও জমির স্বল্পতার পাশাপাশি ঘন ঘন ফসলহানি এবং ফসলের উৎপাদন খরচের সাথে বিক্রয়মূল্যের সামঞ্জস্যহীনতার কারণে তাদের মধ্যে ঋণগ্রস্থতার প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। ফলে এসব প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের যেমন তাদের পৈত্রিক পেশা ধরে রাখতে গ্রামীণ এলিটদের (যারা ধনী কৃষক) কাছ থেকে জমি বর্গা নেয়, তেমনি চাষাবাদের উপকরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে গ্রামীণ এলিটদের কাছ থেকে দ্রুততম সময়ে অর্থ ঋণ অথবা উপকরণ ঋণ গ্রহণ করে থাকে। বিশেষতঃ জটিল ব্যাংকিং পদ্ধতি না বোঝায় এবং ব্যাংক ঋণের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তারা যে কোনো ধরনের ঋণের জন্য গ্রামীণ এলিটদের ওপর অধিকমাত্রায় নিভ্রর করে থাকে। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জ্ঞাতিগোষ্ঠী এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রাধান্যের বিষয়টি বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে (রহমান, ১৯৯১; হোসেন, ১৯৯৪)। ঋণ ও গ্রাম্য রাজনীতি সংক্রান্ত প্রসঙ্গ কোন্ কোন্ গবেষণায় বিশ্লেষিত হয়েছে। এর মধ্যে Bertocci (1970), Jansen (1987), Maloney and Ahmed (1988), Karim (1990), McGregor (1992) প্রমুখ গবেষকগণ তাঁদের গ্রাম সমাজ সম্পর্কিত গবেষণায় প্রাসঙ্গিক আলোচনা হিসেবে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কাঠামোর সাথে গ্রাম রাজনীতির একটি জটিল সম্পর্ক নির্ধারণ ও চিহ্নিতকরণের চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জনে ঋণের সম্পর্ক এক বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বলয় বৃদ্ধির জন্য ঋণদান এবং বর্গায় জমিতে চাষ বা অন্য কোনো সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অনুসারীদের

সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াসে লিপ্ত হয়ে থাকেন। এভাবে গ্রামীণ সমাজে এক ধরনের প্রতিপোষক-অনুগত (Patron-Client) সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও নিজেদের অনুসারীদের ঋণ সুবিধা পাইয়ে দিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে থাকেন গ্রামীণ এলিটেরা। জটিল ব্যাংকিং ব্যবস্থা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে আনুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় অনভিজ্ঞ গ্রামীণ সাধারণ জনগোষ্ঠী তাদের আনুষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা পেতে গ্রামীণ এলিটদের ওপর নির্ভর করে।

সারণী-১.৪ অনুসারীদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে এলিটদের ভূমিকা

গ্রামীণ এলিটদের মতামত	উত্তরদাতা এলিটদের সংখ্যা	শতকরা হার
ঋণ সংক্রান্ত কাগজপত্র সংশোধনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগে অনুসারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান	৩৭ জন	১৮.৫%
রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান	২৫ জন	১২.৫%
ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সমাধান	৫৩ জন	২৬.৫%
ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান	৩৩ জন	১৬.৫%
উত্তর প্রদানে বিরত	৫২ জন	২৬%
মোট	২০০ জন	১০০%

সূত্র: মাঠ জরিপ

সারণী ১.৪-এ লক্ষ্য করা যায় যে, গবেষিত ২০০ জন গ্রামীণ এলিটের মধ্যে ১৪৮ জন (৭৪%) গ্রামীণ এলিট তাদের অনুসারীদের ব্যাংক ঋণ পাইয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ ১৪৮ জন (৭৪%) গ্রামীণ এলিটের মধ্যে মোট ৫৩ জন (২৬.৫%) ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অনুসারীদের ব্যাংক ঋণ পাইয়ে দিতে চেষ্টা করে থাকেন যা মতামত প্রদানকারী এলিটদের মধ্যে সর্বোচ্চ। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটেরা শিক্ষিত, আনুষ্ঠানিক নেতৃত্বের অধিকারী (ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার) এবং ঐতিহ্যিক পরিবারের সদস্য হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষও তাদের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। বিশেষতঃ এসব গ্রামীণ এলিট ব্যাংকের সাথে নিয়মিত লেন-দেন করায় এবং ঋণ প্রদানের খাত এবং শর্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকায় তারা ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে অনুসারীদের ব্যাংক ঋণ পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করার বেলায় সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাছাড়া ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে বিশেষ সখ্যতা থাকায় তারা এক ধরনের কৌশলে কার্য উদ্ধার করে থাকেন। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে তারা ঘুষ প্রদান করে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন তবে তা আনুষ্ঠানিকভাবে তারা স্বীকার করেননি।

মোট ৩৩ জন (১৬.৫%) গ্রামীণ এলিট অনুসারীদের ঋণ পাইয়ে দিতে ব্যাংক কর্মকর্তা এবং অনুসারীদের মধ্যে ঘুষ লেন-দেনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন। ঘুষের একটি নির্ধারিত অংশ তারা পকেটস্থ করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ শ্রেণীর গ্রামীণ এলিটদেরকে অনেকে দালাল বলে চিহ্নিত করে থাকে। মোট ৩৭ জন (১৮.৫%) গ্রামীণ এলিট ব্যাংক ঋণ পাওয়ার শর্তস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন ইউপি চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট, জমির কাগজ-পত্র, ব্যাংকের ফর্ম ইত্যাদি) সংগ্রহে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অনুসারীদের ঋণ পাইয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ শ্রেণীর এলিটদের মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার, বিদ্যালয়-মাদ্রসার শিক্ষক গ্রামীণ এলিট উল্লেখযোগ্য। মোট ২৫ জন (১২.৫%) গ্রামীণ এলিট অনুসারীদের ব্যাংক ঋণ পাইয়ে দিতে রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সরকারি দলের নেতারা বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারেন। সরকারি বিশেষ বিশেষ ঋণ তাদের পকেটস্ত হয় বলে ব্যাংক থেকে অভিযোগ করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এ ধরনের ঋণ তারা নির্ধারিত কাজে ব্যবহার না করে অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করে থাকেন। এ শ্রেণীর এলিটেরা উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতাদের জোরালো সুপারিশের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ উত্তোলন করতে সচেষ্ট হয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে এ জন্য তারা অনুসারীদের কাছ থেকে উৎকোচ-বখশিস গ্রহণ করে থাকেন। অবশিষ্ট ৫২ জন (২৬%) গ্রামীণ এলিট এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব প্রদানে বিরত থেকেছেন।

গ্রামীণ অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রধান উৎস গ্রামীণ এসব এলিট প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের লেন-দেনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। ফলে সরকারি ঋণের সরবরাহ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ঋণ ব্যবহার করতে পারেন। গ্রামীণ এসব এলিট সরকার এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন বলা যায়।

বার. এনজিও এবং গ্রামীণ এলিট

এনজিও ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা রাখছে বলে দাবি করে থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র পরিসংখ্যান, বক্তব্য-বিবৃতি এবং ঋণ আদায়ের হারের উপস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে চিত্রিত করার যে প্রয়াস তা প্রশ্নাতীত নয়। যখন ঋণের কিস্তি পরিশোধে ঋণ গ্রহীতার সর্বস্ব হারাতে হয়, তখন তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে নিশ্চিত সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এ সমস্ত এনজিও ঋণ প্রদানের টার্গেট ব্যক্তি হিসেবে গ্রামীণ মহিলাদের নির্ধারণ করে যাদের স্পষ্ট কোনো পেশা অথবা উপার্জন অনুপস্থিত। কিন্তু ঋণ গ্রহণের পর ৭ দিনের মাথায় ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে গিয়ে তাদের মূলধনে হাত দিতে হয় এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে তারা মূলধন হারিয়ে পাগলপ্রায় অবস্থায় ঋণের জাল থেকে মুক্ত হতে গৃহস্থালি জিনিসপত্র বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এতে পারিবারিক জীবনে নেমে আসে অবিশ্বাস, অশান্তি, ঝগড়া, বিবাদ এবং অবশেষে বিবাহ বিচ্ছেদসহ সৃষ্টি হয় নানাবিধ সামাজিক সমস্যার। আর এসব সামাজিক

সমস্যা উত্তরণে এসব এনজিও'র কোনোই ভূমিকা লক্ষ্যণীয় নয়। এমতাবস্থায় এসব এনজিও তাদের প্রদানকৃত ঋণ আদায়ের বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে যেমন বিচার-সালিশ, থানায় মামলার হুমকি ইত্যাদি। এ পর্যায়ে সমাজ জীবনে সৃষ্ট ভয়াবহ এসব সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন গ্রামীণ এলিটেরা। স্থানীয় উন্নয়নের মূল এজেন্ট এসব গ্রামীণ এলিটদের উপেক্ষা করে এবং তাদের সম্পৃক্ততাকে এড়িয়ে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। কারণ নিজ নিজ গ্রামের সামাজিক বন্ধনের মূল কেন্দ্রবিন্দু এসব গ্রামীণ এলিট এবং তারাই গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষ। তাই এনজিওসমূহের ভেবে দেখা প্রয়োজন, শুধুমাত্র আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার কথা বলে মুনাফা অর্জন যদি তাদের লক্ষ্য না হয় তবে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সঠিক রোড ম্যাপ বাস্তবায়নে গ্রামীণ এলিটদের সম্পৃক্তকরণ এবং দিক নির্দেশনা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন বলে অগ্রসর চিন্তার নাগরিকেরা মনে করেন।

তেরঃ রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণে গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকা

গ্রামের রাস্তা-ঘাট অথবা অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পল্লী গ্রামীণ অবকাঠামো যেমন রাস্তা, বাঁশের সাঁকো নির্মাণ, নালা/নর্দমা খনন ও পুনঃখননে গ্রামীণ এলিটেরা সমষ্টিগতভাবে কাজ করে থাকেন। গ্রামগুলোতে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ যেমন এর অর্থনীতিতে চাপ তৈরী করেছে তেমনি গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থার ওপরও চাপ তৈরী করেছে। যত্রতত্র ঘর-বাড়ী নির্মাণের ফলে গ্রামের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের জন্য রাস্তা-ঘাটের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ছে। তাই পরিকল্পনামাফিক গ্রামের অভ্যন্তরে রাস্তা-ঘাটের পরিকল্পনা এবং তা নির্মাণ ও সংস্কারে গ্রামীণ এলিটেরা গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। এক্ষেত্রে সরকারী অনুদানের প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের নিরলস ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি নিজেরাও উদ্যোগী হয়ে স্থানীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সচলতার জন্য এসব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল ও কিছু নীতি পরামর্শ

১. গ্রামীণ অর্থনীতির মূল শক্তি ভূমি। আর অধিকাংশ ভূমির মালিকানা গ্রামীণ এলিটদের হাতে থাকায় গ্রামীণ অর্থনীতি মূলতঃ তাদের উপরই নিভ্রশীল যা বর্তমান গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে। সুতরাং ভূমির সঠিক এবং সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য গ্রামীণ এলিটদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এতে গ্রামীণ অর্থনীতি যেমন গতিশীল হবে, তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতেও তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

২. আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি উপকরণের ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষির আধুনিকীকরণের মূল অনুঘটক যে গ্রামীণ এলিট শ্রেণী তা চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহজ শর্তে গ্রামীণ এলিটদের

ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

৩. কৃষি ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যান্য দিক যেমন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, ঋণ বিতরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও গ্রামীণ এলিটদের অনবদ্য ভূমিকা চিহ্নিতকরণ নিঃসন্দেহে নীতি নির্ধারকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে। গ্রামীণ বিপুল জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গ্রামীণ এলিটদের এ ভূমিকাকে ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় সংগঠিতকরণ এবং আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটদের আন্তরিক ভূমিকা চিহ্নিত হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। এক্ষেত্রেও গ্রামীণ এলিটদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫. গ্রামীণ এলিটদের ব্যক্তি পর্যায়ের ভূমিকাকে সংগঠিত করে সমবায়ের আওতায় আনতে পারলে গ্রামীণ উন্নয়নে তা তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন কার্যকর প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা।

উপসংহার

গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গ্রামীণ স্থানীয় এলিটদের ভূমিকার বিশ্লেষণ শেষে এটা নিশ্চিত করে দাবি করা যায়, স্থানীয় গ্রামীণ এলিটদের সক্রিয় এবং কার্মিক অংশগ্রহণ ব্যতীত স্থানীয় পর্যায়ের কোনো উন্নয়ন তৎপরতা এমন কি উন্নয়নের সঠিক রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ সহজ এবং সাবলীল হতে পারে না। স্থানীয় উন্নয়নের প্রকৃত এজেন্ট হিসেবে স্থানীয় এলাকায় উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকারভিত্তিতে তা সম্পন্নকরণে তাদের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইতিবাচক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে (যৌথ অথবা এককভাবে) তা সম্পূর্ণ করার আন্তরিক প্রয়াসই তাদেরকে স্থানীয় এলাকায় উন্নয়ন এজেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গ্রামীণ সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি আনয়নের সাথে সাথে গ্রামীণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তনে তাদের যে ভূমিকা তা বিশ্লেষণের দাবি আজ নতুন করে জোরদার হচ্ছে। তাই দাবি করা যায়, গ্রামীণ এলাকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা উত্তরণের সাথে সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সফল এবং পরিশীলিত বাস্তবায়ন ঘটাতে সুদীর্ঘকালব্যাপী গ্রামীণ এলিটেরা যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন তাতে যে কোনো ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা (সরকারি অথবা বেসরকারি) যুক্ত হলে সত্যিকার অর্থেই গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তখন আত্মনির্ভরশীলতার শক্তিতে বলিয়ান হয়ে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন নিজেরাই করতে পারবে। 'গ্রামের উন্নতি হলে বাংলাদেশের উন্নতি হবে' বলে যে দাবি করা হয় তারও বাস্তবায়ন ঘটবে এবং গ্রামীণ উন্নয়নে গণ সম্পৃক্ততার মাত্রা বাড়বে।

তথ্য নির্দেশ

আলম, খুরশিদ (২০০৬) "বাংলাদেশের উন্নয়নে জন-অংশগ্রহণ: একটি পর্যালোচনা," বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুর্বিংশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ঢাকা।

ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল (২০০৩) গ্রামোন্নয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা: মেহের পঞ্চগ্রাম নমুনা বিশ্লেষণ, (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ।

করিম, এ.এইচ.এম. জেহাদুল (২০০২) "ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গবেষণায় নৃ-বৈজ্ঞানিক কৌশলসমূহের প্রয়োগ: দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা," এস এম নুরুল ইসলাম (সম্পা.), সমাজ, শরীর ও পরিবেশ নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধাবলী, ঢাকা: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশ সরকার (২০১৬) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ,অর্থ বিভাগ, ঢাকা: অর্থ মণ্ত্রালয়।

বেগম, রহিমা (২০০৩) "রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ," (অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস), ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রহমান, আতিউর (২০০৩) "সামাজিক পুঁজি ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ," বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বিংশতিতম, ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

রহমান, এম ফয়জার (১৯৯৪) "কৃষিতে আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের পরিবেশগত সমস্যা," কাজী তোবারক হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), বাংলাদেশের গ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ।

সরকার, আবু ইলিয়াস (১৯৯২) "পল্লী উন্নয়নের ক্রটি ও অসঙ্গতি: একটি মাঠ পর্যায়ের পর্যালোচনা," সমাজ নিরীক্ষণ, ৪৫ সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

"স্টেট অ দ্য ওয়ার্ল্ডস ফরেস্ট-২০১৬ প্রতিবেদন," ঢাকা: প্রথম আলো: ২৬ জুলাই, ২০১৬

হাকিম, এম.এ. (১৯৯৪) "গ্রাম বাংলায় সেচ ব্যবস্থা: উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত," কাজী তোবারক হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), বাংলাদেশের গ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ।

হামিদ, মুহাম্মদ আবদুল (১৯৮৮) "পল্লী উন্নয়ন বাংলাদেশ," ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স।

হোসেন, মোঃ আনোয়ার (১৯৯৪) "পল্লী ঋণ ব্যবস্থা," কাজী তোবারক হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাঃ), বাংলাদেশের গ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ।

Arefeen, H. K. S. (1986) "Changing Agrarian Structure in Banglades- Shimulia: A Study of A Periurban Village," Dhaka: Center for Social Studies.

Arens, J. & Van Beurden, J. (1977) "Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh," Birmingham: Third World Publications.

Bertocci, Peter. J. (1970) "Elusive Villages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan (Unpublished Ph.D. Dissertation)," Michigan: Michigan State University, USA,

Blanchet, Therese (1986) "Rural Women, Saving and Credit: An Anthropological View", Dhaka.

Bonjen, C.M. and Olson, D.M. (1964) Community Leadership: Directions for Research," Administrative Science Quarterly, Vol. IX. No. 3, Dhaka. December

Bottomore, T.B. (1964) "Elites and Society," London: C.A. Watts.

Dahl, Robert A. (1963) "Who Governs," New Haren: Yale University Press.

Darshankar, Ay (1979) "Leadership in Panchayati Raj," Jaipur: Pancheel Prakashan.

Dube, S.S. (1951) "Indian Village," London: Routledge & Kegan Pal.

Giddens, Anthony (1973) "Elites in the British Class Structure," in P. Stansworthy and Anthony Giddens, Elites and Power in British Society, London: Cambridge University Press.

Herbon, D. (1995) "The system of Exchange and Distribution in a Village in Bangladesh," Institute of Rural Development, Gottingen: Geory-August-Universital.

Hunter, Floyd (1953) "Community Power Structure: A Study of Decision Makers," Chapel Hill: The University of Garden Press.

Hussain, Md. Anwar (1987) "Informal Credit Market in a Traditional Society: A Case Study of a Village in Bangladesh" (Unpublished M.Phil. Dissertation), Rajshahi University: IBS.

Islam, Didarul (1985) "Rural Finance,"Dhaka: Apex Publishers.

Jennings, M.K. (1964) "Community Influentials: The Elites of Atlanta," London: The Free Press of Glencoe.

Karim, A.H.M. Zehadul (1979) "Socio-Economic Background of the Rural Elites: A Case Study of Two Selected Villages," Dhaka: Bangladesh University Grants Commission.

Karim, A.H.M. Zehadul (1983) "Rural Elites and Their Power Structure in Bangladesh," (Unpublished M.A. Thesis) of the Dept. of Anthropology, USA: Syracuse University.

Karim, A.H.M. Zehadul (1990) "The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society," New Delhi: Northern Book Centre.

Kornhauser, William (1965) The Politics of Mass Society, London: Routledge & Kegen Pal.

Lasswell, H.D. et al. (1952) The Comparative Study of Elites, Standford: Hoover Institute.

Linton, R. (1936) The Study of Man, New York: Appleton Century.

Maloney, A.B.S. et al. (1988) Rural Savings and Credit in Bangladesh, Dhaka: University Press Ltd.,

McGregor, J. Allister (1992) Village Credit and Reproduction of Poverty in Contemporary Rural Bangladesh, (paper from the SASE Annual Conference), USA: Irvine California.

Mead, G. H. (1934) Mind, Self and Society, C.W. Morris (ed), Chicago: The University of Chicago Press.

Mills, C. Wright (1956) The Power Elite, New York: McGraw Hill Book Company.

Mukherjee, Ramkrishna (1971) Six Villages of Bengal, Bomby: Popular Prakashan.

Pareto, Vilfredo, (1935) The Mind and Society, New York: Har Court and Brouches Co., Vol. 4.

Rumi, Syed Nasar Ahmed (1985) Rural Elites and their Role in Development: A Case Study in Kustia District (Unpublished M.Phil. Thesis), Rajshahi University: IBS.

Sarbin, T.R. (1954) "Role Theory," G. Lindzey, ed., Hand Book of Social Psychology, Vol.1, Cambridge: Mass: Adison-Wesley.

Schulze, R.O. and L.U. Blumberg (1959) The Determination of Local Power Elites, The American Journal of Sociology, 13 (3),

Sharma, S.S. (1979) Rural Elites in India, Delhi: Sterling Publisher.

Sing, Harjinder (1976) Authority and Influence in two Sikh Villages, New Delhi: Sterling Publisher.

Singer, Marshall, (1964) The Emerging Elite: A Study of Political Leadership in Ceylon, Cambridge: The Press.

Socio-Economic Survey Board (1965) Report of the Survey of Rural Credit and Rural Unemployment in East Pakistan, Dhaka: Dhaka University.

Van Schendel, W. (1982) Peasant Mobility: The Odds of life in Rural Bangladesh," New Delhi: Manohar.

Wood, G.D. (1978) "Class Differentiation and Power in Bandokgram: The Minifundist Case," Ameerul Haque (ed.) Exploitation and the Rural Poor, Comilla: BARD, 1978

লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (ইতোপূর্বেকার ষান্মাসিক প্রশাসন সমীক্ষা) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাৎসরিক বাংলা সাময়িকী। প্রতি বাংলা সনের কার্তিক মাসে এটি প্রকাশিত হয়। এতে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণামূলক নিবন্ধ, গবেষণা-টীকা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়ে থাকে। তবে লোক-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক লেখা অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্নাল বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি, এ-মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।

লেখা মানসম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটার মুদ্রিত হতে হবে। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবে।

বাংলা কম্পোজ : "বিজয়-সুতন্বী এমজে" ফন্ট এবং ইংরেজি : "টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট।

প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিস্কেটের কভারে লেখকের নাম, প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ করতে হবে।

প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

মূল কপিসহ পাণ্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্থ পরিচ্ছন্ন কপি সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।

প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।

ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজিতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

প্রবন্ধের পাদটীকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থস্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সময়িকীর নাম, খন্ড ও ইস্যু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে পারেন।

লেখা প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার কপি বিনামূল্যে পাবেন।

প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পর্যদ এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিস্কেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।

মুদ্রিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে কেন্দ্র নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।